অল ইণ্ডিয়া

হেয়ার ইনডাস্ট্রি কোং

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

উৎসর্গ

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী (গোলকপুর)

প্রীতিভাজনেষু

বীরেন,

তোমার বাসাতেই "হেয়ার ইনডাস্‌ট্রির" জন্ম। এর প্রথম আদরও তোমার নিকট। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে তোমার হাতেই তুলে দিলাম।

ধীরেন বিশী

একবার কাশীতে এক জনসভায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বিশী তাঁহার রচিত একটি গল্প পাঠ করেন। 'অল্ ইণ্ডিয়া হেয়ার ইন্ডাস্ট্রি কোং' গল্পের সকৌতুক ব্যঙ্গরস আমার এবং সভাস্থ অনেকেরই অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছিল। সেই গল্পটিই এই গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্প এবং তাহা হইতেই পুস্তকের নামকরণও। ধীরেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। তাঁহার রচনা পড়িয়া মনে হয় যে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তাঁহার গল্পগুলি নিছক কল্পনাপ্রসূত হইলেও অনেক স্থলে বর্ত্তমান প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তির বেশ একটু কৌতুককর সন্ধান দেয়। তিনি যে এই বর্ত্তমান তরুণ-তরুণীদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং রীতি-প্রকৃতি হইতে ব্যঙ্গরসের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার সূক্ষ্ম রসনানুভূতির প্রকৃষ্ট পরিচয়। তাঁহার লিখিবার ভঙ্গীটি যেমন মনোজ্ঞ, তেমনি তাঁহার রসসৃষ্টির মধ্যেও বেশ নূতনত্ব আছে। রস রচনার জন্য কষ্টকল্পিত প্রয়াস ইহাতে নাই। সরল স্বাভাবিক গতিশীলতাই এই রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য। এই গল্প কয়েকটিতে যে নির্ম্মল হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে আশা হয় যে এই নবীন লেখক শীঘ্রই তাঁহার নিজের জন্য সাহিত্য সমাজে একটি আসন করিয়া লইতে

পারিবেন। সরস ও মার্জিতরুচিসম্পন্ন ব্যঙ্গের সৃষ্টিতে লেখক যে প্রশংসনীয় সফলতা লাভ করিয়াছেন ইহাতে আমি আনন্দিত। করুণ রসেও তাঁহার হাত আছে; তাঁহার 'অস্পৃশ্য' গল্পটিতে করুণরসের অবতারণায়ও নূতনত্ব আছে। আমি লেখকের সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসকে অভিনন্দিত করি। ইতি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৮ই ভাদ্র ১৩৫০

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সাহিত্যের সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। তবে নিছক রসসৃষ্টিকে যারা অবহেলার চক্ষে দেখেন না, আমি সেই দলের। রচনায় গভীরতা সন্ধান করা যাদের অভ্যেস—তারা গল্পগুলি পড়লে হতাশ হবেন। পাঠকের রসানুভূতিকে সামান্য তৃপ্ত করাই আমার উদ্দেশ্য। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের প্রতি শ্লেষ নিক্ষেপ করা নয়।

গল্পগুলি ভারতবর্ষ, প্রবর্তক, উত্তরা, দেশ প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। পূজনীয় পিতৃদেবের উৎসাহ ও আগ্রহাতিশয্য ব্যতীত এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা সম্ভবপর হোত না। তাঁকে প্রণাম জানাই। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় একটি ভূমিকা লিখে পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। নানা বিষয়ে আমি তাঁর স্নেহলাভে ধন্য। এটা তারই অভিব্যক্তি মাত্র। প্রচ্ছদপটটি এঁকেছেন আমার পরম সুহৃদ শিল্পী শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্ধুত্বের দাবীকে কখনও তিনি উপেক্ষা করেন না। সেজন্য আমরা গৌরবান্বিত।

ধীরেন্দ্রনাথ বিশী

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্ট্রি কোং"

ক্রমান্বয়ে তিনবার আই, এ ফেল করিয়া সাতকড়ি আবিষ্কার করিল পড়াশোনার 'লাইন' তাহার নয়। বাবা, মা চতুর্থবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিলেন। সাতকড়ি যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া বুঝাইয়া দিল—সব জিনিষ সকলের ধাতে বরদাস্ত হয় না। অনর্থক ইহার পিছনে অর্থব্যয় না দিয়া যাহাতে দু'পয়সা ঘরে আসে সেই ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয়।

পয়সা ঘরে আনা যে অবাঞ্ছনীয় একথা ভ্রম ক্রমেও কেহ উচ্চারণ করিল না। কিন্তু তীব্র মতভেদ দেখা দিল উহার পন্থা লইয়া।

বন্ধুরা পরামর্শ দিল, চাকরী কর্। বাঁধা মাইনে—কোন হাঙ্গাম নেই। আয় বুঝে ব্যয় করলেই যথেষ্ট। পৈতৃক জমিদারী আছে। বাবা বলিলেন, যা বাজার চাকরী করে আর খেতে হবে না। নিজের যেটুকু আছে দেখে শুনে গুছিয়ে নাও।

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্ট্রি কোং"

সাতকড়ি কংগ্রেসের ভক্ত। জমিদারী তার দু'চক্ষের বিষ। বলিল, জমিদারী আর ক'দিন? জানেন,—কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছে?

রামগতিবাবু কংগ্রেসের নাম শুনিতে পারিতেন না। তাঁর প্রায় সমস্ত মহালই কংগ্রেসের প্রচার কার্য্যের জন্য বিদ্রোহী হইয়াছে। রাগের মাথায় একটা অশিষ্ট মন্তব্য করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিছুদিন পরের কথা! নানাস্থানে চাকরীর উমেদারী করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া সাতকড়ি প্রতিজ্ঞা করিল, 'বিজনেস' করিবে, একেবারে 'ইন্‌ডিপেনডেণ্ট লাইন'। ব্যবসা না করিয়াই বাঙ্গালীর অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু এখানেও কম সমস্যা নহে। কিসের ব্যবসা করা যায়? বন্ধুরা বলিল, রেস্তোরাঁ খোল্। চা সকলেই খায়—অথচ প্রত্যেক কাপে এক পয়সা খরচ হয় কিনা সন্দেহ। একেবারে "ফিফ্‌টি পারসেণ্ট" লাভ।

সাতকড়ি দৈনিক 'লেইকে' বেড়াইতে যায়, সেখানে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি বলিলেন, মাছের ব্যবসায় করুন মশায়। দু'দিনে ফেঁপে উঠবেন—টাকায় টাকা আসবে।

রামগতিবাবু বলিলেন, বাঙ্গালী কোন দিন ব্যবসা করতে পারবে না। ও দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়। এখনও মহালে যাও—সামনে আশ্বিন কিস্তি; ফেল্ পড়লে সংসারে টানাটানি পড়বে।

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্‌ট্রি কোং"

মা ব্যবসার কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। আড়ালে ডাকিয়া সাতকড়িকে অনেক বুঝাইলেন। ওসব ভদ্রলোকের কাজ নয় বাবা। সোনার শরীর দু'দিনেই কালি হয়ে যাবে। একটা কথা বলবো—শুনবি ?

একটু থামিয়া মা বলিলেন, দেখে শুনে নিজের পছন্দসই একটা বিয়ে কর। ঘরে লক্ষ্মী এলে কোন দিক আর ভাবতে হবে না।

সাতকড়ি রাগিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পর প্রায় দিন পনেরো কাটিয়া গিয়াছে। ব্যবসার 'সাব্‌জেক্ট' এখন অবধি মনোমত পছন্দ হইল না। ভাবিতে ভাবিতে সাতকড়ি প্রায় শুকাইয়া উঠিল।

বন্ধুদের পরামর্শে চুল চেরা হিসাব করিয়া এক একবার মনে হয় কয়লার ব্যবসাতেই সর্ব্বাধিক লাভ, কিন্তু দু'দিন যাইতেই মনটা বিরূপ হইয়া ওঠে। কলিকাতা সহরে হাজার হাজার কয়লার দোকান আছে ; তাহার দোকানেই যে অধিক খরিদ্দার হইবে ইহার কেহ 'গেরান্টি' দিতে পারে না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া সাতকড়ি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে ব্যবসায়ে নূতনত্ব চাই। সে এমন ব্যবসা আরম্ভ করিবে যাহা পূর্ব্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই—সকলকে তাক লাগাইয়া দিতে হইবে।

এখানেও সমস্যা। বন্ধুদের সঙ্গে "সবজেক্ট কমিটি"—"ওয়ারকিং কমিটি"—ইত্যাদি নানারূপ কমিটি স্থাপন করিয়া সে ব্যবসার অভিনবত্ব সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতে লাগিল।

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্ট্রি কোং"

একদিন 'লেইক' হইতে বেড়াইয়া ফিরিবার পথে যতীনদাস রোডের একটা বাড়ীর জানালা হইতে কি একটি দ্রব্য সাতকড়ির মাথার উপর উড়িয়া পড়িল।

সাতকড়ি হাত দিয়া উঠাইয়া দেখিল—কোন মহিলার এক গোছা আঁচড়ানো চুল।

ব্যাপারটা কিছুই নয়। অন্য লোক হইলে হয়ত ভ্রূক্ষেপও করিত না। কিন্তু যাহারা জিনিযাস তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। আঁচড়ানো চুল দেখিয়া সাতকড়ির মাথার ভিতর বিদ্যুতের মত একটা ভাবের উদয় হইল।

ভারতবর্ষে লম্বা চুল সম্পন্ন নারীর সংখ্যা অল্প নহে। আশা করা যায় প্রত্যেকেই প্রত্যহ চুল বাঁধে এবং চুল বাঁধিবার সময় প্রত্যেকের মাথা হইতেই খানিকটা করিয়া চুল উঠিয়া থাকে। এই ওঠা চুল কি হয়? কিছুই হয় না। রাস্তায় কিংবা বাড়ীতে আবর্জ্জনার মধ্যে পড়িয়া থাকে। কিন্তু ভারতের সমগ্র স্থান হইতে যদি এই আঁচড়ানো চুল সংগ্রহ করা যায়—

সাতকড়ি আনন্দে আর ভাবিতে পারে না। একটা বিরাট লাভজনক ব্যবসা। কত হাজার হাজার মণ চুল সংগ্রহ হইবে এবং ইহা কত রকম প্রয়োজনে সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে। লেপ, তোষক—বালিশ—কুশন, গদি, কার্পেট ইত্যাদি অসংখ্য জিনিষ তৈয়ারী হইতে পারে। তুলা হইতে দামও ঢের সস্তা পড়িবে—কেননা চাষ আবাদের হাঙ্গামা নেই। ইহা ব্যতীত চুল দিয়া

চমৎকার সরু দড়ি হইবে। সে মানস-নয়নে দেখিতে লাগিল—সেই সব সরু দড়ি ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপানে কিরূপ সাদরে অভ্যর্থিত হইতেছে। সে ইহার নাম দিবে—"ইণ্ডিয়ান হেয়ার রোপ"।

আনন্দের নেশায় একটা রেস্তোর াঁয় ঢুকিয়া সাতকড়ি চা ও ডেভিল খাইয়া ফেলিল।

সেই দিনই গভীর রাত্রে "ওয়ারকিং কমিটির" জরুরী অধিবেশনে তুমুল জয়ধ্বনি ও ভোটাধিক্যে সাতকড়ির প্রস্তাব কার্য্যকরী বলিয়া গৃহীত হইয়া গেল। সে হইল "ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর"—কারণ, মূলধন তাহারই অধিক।

'ওয়ারকিং কমিটির' পাঁচজন সদস্য লইয়া একটা "পার্লামেণ্টারী বোর্ড" গঠিত হইল। তাহারা ব্যবসায়ের যাবতীয় হিসাব নিকাশ ও 'অফিস ওয়ার্ক' ইত্যাদি পরিচালনা করিবেন।

বড় বাজার ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল, সেইখানে একটা বড় অফিস ভাড়া লওয়া হইবে স্থির হইয়া গেল এবং ভারতের সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রের মারফত উচ্চ কমিশনে এজেণ্ট অর্গানাইজার্স আহ্বান করা হইবে এই মর্ম্মে গুটিকয়েক প্রস্তাব গৃহীত হইল। তাহাদের কর্ত্তব্য হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত যাবতীয় নারীর আঁচড়ানো চুল সংগ্রহ করা।

ব্যবসায়ের নামকরণ হইল—

"অল্ ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্ট্রি কোং"

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাসট্রি কোং"

অফিস ইত্যাদি উত্তমরূপে সজ্জিত করিতেই সাত দিন কাটিয়া গেল। বাহিরের অন্যান্য খুঁটিনাটি কাজও একরূপ সম্পন্ন হইল।

অষ্টম দিবসে উদ্বোধন উৎসব।

বিরাট জাঁকজমকের মধ্যে কলিকাতার একজন বিশিষ্ট নাগরিক উদ্বোধন করিলেন এবং বক্তৃতায় সমবেত নারীগণকে এই জাতীয়-শিল্পকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা যেন প্রত্যহ চুল বাঁধেন। সেই সমস্ত চুল নষ্ট না করিয়া "হেয়ার ইনড্রাসট্রি কোং" হইতে প্রদত্ত ছোট বেতের ঝুড়ির ভিতর জমাইয়া রাখেন এবং প্রতি রবিবারে মুষ্টি ভিক্ষার মত এজেন্টদের হাতে ওজন করিয়া দিয়া পরিবর্ত্তে কোম্পানীর রসিদ লন। এক মাস পর সেই সমস্ত রসিদ মিলাইয়া কোম্পানী হইতে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করা হইবে।

রসিদ হারাইয়া গেলে কোম্পানী দায়ী নয়।

জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, পুরুষ মানুষের চুলে কাজ হইবে কি না?

উত্তরে সভাপতির অনুমতি লইয়া সাতকড়ি বলিল, আমাদের যা স্কীম তাতে উস্কো-খুস্কো জট পাকানো চুলেরই প্রয়োজন। তাতে দড়ি, লেপ, বালিশ ইত্যাদি তৈরী করিবার সুবিধা। তবে তাহাদের কোম্পানীর লেবরটরীতে পুরুষের চুল লইয়া গবেষণা হইবে, এবং ভবিষ্যতে ইহাকেও যাহাতে কার্য্যকরী করা যায় সে জন্য কোম্পানী যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাসট্রি কোং"

সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করিবার পর অধিক রাত্রে উৎসবের কার্য্যসূচী সম্পন্ন হইল।

ইহার পর আর মরিবার ফুরসৎ নাই। ইতিমধ্যে বহু এজেন্টদের দরখাস্ত হেড অফিসে পৌছাইয়াছে। প্রত্যেকেই কমিশনে আঁচড়ানো চুল সংগ্রহ করিতে রাজী আছে।

এজেন্টদের কমিশন ইত্যাদি স্থির করিবার ভার পার্লামেণ্টারী বোর্ডের উপর—তাঁহারা সেদিকে মাথা ঘামাইতে লাগিলেন।

সাতকড়ি ওয়ারকিং কমিটির একটা অধিবেশন আহ্বান করিয়া চুলের মূল্য নিরূপণ কবিয়া ফেলিল। সোজা হেড অফিসে জমা দিলে প্রতি সের ৭৲ (সাত টাকা) এবং এজেন্টদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে প্রতি সের ৫৲ (পাঁচ টাকা) পড়িবে। কমিটি সিদ্ধান্ত করিলেন এরূপ একটি অভিনব ব্যবসায়ের জন্য প্রথমে মূল্যের হার অধিক রাখাই বাঞ্ছনীয়—নতুবা বহুল প্রচারের সম্ভাবনা কম।

প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নরহরি যথারীতি ভারতের সমস্ত মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রিকাগুলিতে চুলের মূল্যের হার প্রকাশিত করিল।

বড়বাজারে হেড অফিসের পাশেই একটা প্রকাণ্ড গুদাম ঘর ভাড়া লওয়া হইয়াছে। প্রাপ্ত চুল বস্তা করিয়া এখানে জমা রাখা হইবে, কারণ কমিটির ধারণা অন্ততঃ ৫০০০ মণ কাঁচা মাল সংগ্রহ না হইলে ব্যবসা 'ষ্টার্ট' করা সম্ভবপর নয়।

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাসটি্র কোং"

সবই হইল ; কিন্তু সহৃদয় দেশবাসী সাতকড়ির জাতীয় শিল্পকে বোধ হয় অন্তরের সহিত গ্রহণ করিল না। ফলে, এক মাস হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া এজেণ্টগণ মাত্র ৭।।০ (সাড়ে সাত সের) চুল সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইল।

কমিটির সভ্যগণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু ধৈর্য্য হারাইলে চলিবে না। কমিটির জরুরী অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হইল—বাঙ্গালীর ধৈর্য্য নাই বলিয়াই সকল বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া আছে, অতএব অদ্য হইতে এজেণ্টগণ অসীম ধৈর্য্যের আদর্শ 'রবার্ট ব্রুসের' প্রতীক স্বরূপ পকেটে কৌটায় একটি মরা মাকড়সা রাখিবে। মন নিরাশ হইবার উপক্রম হইলেই কৌটা খুলিয়া মাকড়সাকে দর্শন করিলে হৃদয়ে নব-অনুপ্রেরণার সঞ্চার হইবে।

হেড অফিসে রবার্ট ব্রুসের একখানি কাল্পনিক ছবি টাঙ্গানো হইল—তাহার নীচে ডি, এম, সি সূতা দিয়া একটি মাকড়সাকে ঝুলাইয়া রাখা হইল। কর্ম্মীদের ভিতর হতাশভাব কোন প্রকারেই যাহাতে না আসে—

ইহাও কমিটির পক্ষে নিরাপদ মনে হইল না।

"ষ্টাটিস্‌টিকাল" (statistical) গবেষণা সুরু হইল।

ভারতের লোক সংখ্যা ৩২ কোটী। কম করিয়া ধরিলেও অন্ততঃ ১০ কোটী (দশ) নারী হইবে। তাহাদের মধ্যে ২।। কোটী

(আড়াই) বিধবা বাদ দিলে ৭॥ (সাড়ে সাত) কোটী সধবা ও কুমারী থাকে। পাগল, অসুস্থা ইত্যাদিতে আর এক কোটী বাদ পড়িবে—তথাপি ৬॥ (সাড়ে ছয) কোটী নারী বর্ত্তমান। গড়পড়তায় অনেকে চুল বাঁধে না সেজন্য আধ কোটী ছাড়িযা দিলেও ৬ (ছয়) কোটী 'নীট' চুল সম্পন্ন নারীর চুল পাওযা উচিত। প্রত্যেকের মাসে 'আধপো' করিয়া চুল সংগ্রহ হইলে ৭৫ লক্ষ (পঁচাত্তর) সের হয অর্থাৎ মাসে ১ লক্ষ ৮৭॥ হাজার মন (একলক্ষ সাড়ে সাতাশী হাজার মন)

ইহার পরিবর্ত্তে ৭॥ সেরের কল্পনা কমিটির কোন সদস্যেরই মাথায় প্রবেশ করিল না।

কেন এমন হইতেছে ? এজেণ্টদের তলব দেওয়া হইল। তাহারা যথারীতি গৃহে গৃহে বেতের ঝুড়ি সরবরাহ করিয়াছে কিনা তার 'ষ্টেট্‌মেণ্ট' গ্রহণ করা হইল।

সকলের মুখেই এক কথা। প্রায় অধিকাংশ বাড়ী হইতেই চুল পাওয়া যায় না।

কমিটির চক্ষুস্থির ! নারী আছে অথচ চুল পাওয়া যাইবে না— ব্যাপার কী ? জোর তদন্তের আবশ্যক।

পার্লামেণ্টারী বোর্ডের অধীনে একটা 'এনকোয়ারী' কমিটি গঠিত হইল—সাতকড়ি হইল সভাপতি।

এক মাসের ভিতর কমিটির নিকট তাহাকে তদন্তের ফলাফল জানাইতে হইবে।

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্ট্রি কোং"

সাতকড়ি স্থির করিল প্রথমে কলিকাতায় তদন্ত আরম্ভ করিবে—তাহা হইলে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হইতে বিশেষ বিলম্ব হইবে না। ট্রামে, বাসে, ট্যাক্সী, রিক্সায় সে কলিকাতায় ঘুরিতে থাকিবে। রাস্তা দিয়া যাইবার সময় বারান্দা ও জানালাগুলির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে এবং কোন বাড়ীতে তিন চারিটী মেয়ে একত্র দেখিলেই বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করিবে—জাতীয় শিল্পকে সাহায্য করা হইতেছে না কেন?

পরদিন বালীগঞ্জে হিন্দুস্থান পার্কের একটা বাড়ীর গাড়ী-বারান্দায় কয়টি মেয়েকে একত্র দেখিয়া সাতকড়ি দরজার 'কলিংবেল্' টিপিয়া দিল। দরজা খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি বিপুলকায় মহিলা দর্শন দিলেন।

সাতকড়ি ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিল, বাড়ীর মালিক যিনি—তাঁর সঙ্গে—একটু—

মহিলাটি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, আমারই বাড়ী। কি দরকার বলুন—

সাতকড়ি ঘামিতে আরম্ভ করিয়াছে। বলিল, আমি 'বিজনেস্ ম্যান'। আপনি বোধ হয় 'অল্ ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্ট্রির' নাম শুনে থাকবেন; আমি তারই ম্যানেজিং—

ও' বলিয়া মহিলাটি রিণি, ঝুনু, মিনি, লিলি বলিয়া চারবার ডাকিলেন। পরমুহূর্ত্তেই চারিটি সুবেশা তন্বী একরূপ নাচিতে নাচিতে উপস্থিত হইল।

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্‌ট্রি কোং"

মহিলা সাতকড়ির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, দেখেছেন ?

সাতকড়ির গলা শুকাইয়া আসিযাছে। অস্ফুটস্বরে বলিল, —আজ্ঞে ঠিক, মানে,—কি বলছেন—বুঝতে পারছি না—

কন্যাদের প্রতি আদেশ হইল, পেছন ফিরে দাঁড়াতো তোরা—

রিণি, ঝুনু, মিনি, লিলি মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিল।

সর্ব্বনাশ। সাতকড়ি দেখিল—সবকটিরই চুল ছোট করিয়া ঘাড় অবধি ছাঁটা। আধুনিক মতে 'ববড হেয়ার'। উহা বাঁধিবেই বা কি আর উঠিবেই বা কি। তবে কি ইহারই জন্য—

সে অসহায ভাবে মহিলার দিকে তাকাইল।

তিনি বলিলেন, এরা চুল বাঁধে না—'শ্যাম্পু' করে। নমস্কার —প্রতি নমস্কারের পূর্ব্বেই সশব্দে দরজা বন্ধ হইয়া গেল এবং ভিতরে অদ্ভুত মিহি ধরণের চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল। পকেট হইতে কৌটা বাহির করিয়া মাকড়সাটাকে একবার দেখিয়া সাতকড়ি শ্যামবাজারের উদ্দেশ্যে ট্রামে উঠিয়া পড়িল। এই সমস্ত প্রগতিশীল মহিলাদের সে আন্তরিক ঘৃণা করে।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের একটা বারান্দার দিকে নজর পড়িতেই 'বাঁধকে' বলিযা সে দ্রুতগতিতে ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল।

দরজার কড়া নাড়িতেই নাদুসনুদুস কালো চেহারার একটি ভদ্রলোক দরজা খুলিযা কটমট করিযা চাহিযা রহিলেন! দৃষ্টির অর্থ,—কেন বিরক্ত করতে এসেছো ?

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্‌ট্রি কোং"

সাতকড়ি বলিল, 'অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্‌ট্রি কোং' থেকে আসছি।

ভদ্রলোক বলিলেন, 'ইনস্যুযরেন্স'এর দালাল তো ?

সাতকড়ি ভরসা পাইয়া বলিল,—আজ্ঞে না। আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান। ভারতের লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার—

যাক্—যাক্। বক্তৃতা থামাও, কি দরকার ?

সাতকড়ি অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে বলিল, আজ্ঞে, আপনাদের বাড়ীতে ক'টি মেয়ে দেখলাম, তাঁদের আঁচড়ানো চুল আমাদের দরকার। মানে, এই 'নযেই আমরা 'বিজ্‌নেস' ষ্টার্ট করেছি। পরে অবশ্য—

কি ? ভদ্রলোক চোখ পাকাইয়া হাতের মুঠা শক্ত করিলেন। ফকড়ামির আর জায়গা পাওনি ? ভদ্রলোকের মেয়েদের মাথার চুল - গদা—গদা—

কণ্ঠস্বরের বোধ হয় তাৎপর্য্য আছে। পরক্ষণে ষণ্ডাধরণের একটি লোক বাঁশের লাঠি লইয়া উপস্থিত হইল।

ভদ্রলোক বলিলেন, দেখেছো ?

এইবার আর বুঝিতে পারিলাম না বলা চলে না। সে একরূপ মরিয়া হইয়া বলিল, আমি 'বিজনেস্ ম্যান্'। সে রকম কোন উদ্দেশ্য নিয়ে—

ব্যস্—আর কথা নয়। বেরোও—বেরোও—

গদাও ততক্ষণে লাঠিটা উঁচু করিয়াছে।

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্‌ট্রি কোং"

সাতকড়ি বেগতিক বুঝিয়া একলাফে বাহির হইয়া পড়িল।

উঃ—কি লাঞ্ছনা। সে জীবনে এরকম অপমান ভোগ করে নাই। অত বড় একটা বিজনেস কোম্পানীর সে ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর তার কি না এই দুর্ভোগ—

পরমুহূর্ত্তে ভাবিল—দেশের কাজে স্বার্থত্যাগ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কংগ্রেস সভাপতি—মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি দেশের নেতাগণও অনেক সময় ইষ্টকপ্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া থাকেন। ইহা পরাজযেব গ্লানি নয—বিজযের জয়টীকা।

নিমতলা ষ্ট্রীটে একটি বাড়ীব জানালার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সাতকড়ি রিক্সা হইতে 'রোখো' 'রোখো' বলিযা চীৎকার করিয়া উঠিল।

জনৈক মহামহোপাধ্যায তর্কভূষণ মহাশযের বাড়ী। ছোট্ট একটি মেযে অর্দ্ধভুক্ত একটি মূলা হাতে করিযা দরজা খুলিযা দিল। নাম বলিতেই বলিল, দাদু নাইছে। আপনি বৈঠকখানায় বসুন।

বৈঠকখানা মানে তক্তপোষের ওপর ময়ুর ও বাঘ আঁকা দু'টো জাপানী মাদুর এবং তৈলসিক্ত একটা তাকিয়া।

সাতকড়ি বসিযা পড়িল।

পাঁচ মিনিট পব নগ্নগাত্রে—খড়ম পাযে শীর্ণ তর্কভূষণ মহাশয দর্শন দিলেন।

সাতকড়ি কি ভাবিয়া হঠাৎ পায়ের ধূলা মাথায় লইল।

তর্কভূষণ মহাশয প্রশ্ন করিলেন,—মহাশযের কোথা থেকে আগমন হচ্ছে?

সে আদ্যোপান্ত সব খুলিয়া বলিল। গদাধরের কথাও বাদ পড়িল না, শেষে মন্তব্য করিল,

বাঙ্গালী জাতির কোনদিন উন্নতি হ'বে না, পণ্ডিতমশায়। বিজ্‌নেস 'এ্যাপ্রিসিয়েট' করবার ক্ষমতাই এদের নাই। কিন্তু আপনি তো শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, আপনিই বলুন—বাংলার কি এই অবস্থা পূর্ব্বে ছিল? চাঁদসদাগর ধনপতি সদাগর—শ্রীমন্ত সদাগর এরা তো বাংলারই 'বিজনেস ম্যান'।

মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয় একাগ্রচিত্তে সমস্তই শুনিতেছিলেন। বলিলেন, কাজটা ভাল কর নি বাবা। মাতৃজাতির কেশ স্পর্শ করা অত্যন্ত গর্হিত পাপ। এর জন্য শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। নারী জাতিকে শক্তিরূপিনী চণ্ডীর সঙ্গে তুলনা করা হয়—তাঁদের কেশ নিয়ে কি না তোমরা ব্যবসা করবে? নরকেও স্থান হবে না তোমাদের। দোষ দেবো কাকে? ঘোর কলিকাল উপস্থিত হয়েছে।

সাতকড়ি অধীর হইয়া বলিল, কিন্তু 'বিজনেস্ ইজ বিজনেস'

তর্কভূষণ মহাশয় কানে আঙুল দিয়া বলিলেন, থামো—থামো। এসব কথা কানে শোনাও পাপ।—নারায়ণ—নারায়ণ। দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণের জন্য কৌরবদের সর্ব্বনাশ হ'লো স্মরণ হয়?

সাতকড়ি রাগিয়া বলিল, ও সব 'বোগাস্'। কোন প্রমাণ নেই। আমার 'হিষ্ট্রি' ছিল—মহাভারত যুগের কোন 'ইনস্ক্রিপসান'

(inscription) কিংবা 'কয়েন্‌স্‌' (coins) এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নি।

তর্কভূষণ মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়াছেন। তাহ'লে আসি বাবা। পূজোর সময় হোলো। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। বলিয়া দড়ি হইতে নামাবলী লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সাতকড়ি শুনিতে পাইল ভিতরে চাপা গলায় কাহাদের উদ্দেশ্যে ধমকানো হইতেছে। ধিঙ্গি মেয়ে সব। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পুরুষ মানুষের দিকে 'হাঁ' করে তাকাতে লজ্জা করে না? যথেষ্ট হইয়াছে আর নয়। বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে—মাথার ওপর রৌদ্র তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষুধায় পেটের নাড়িগুলি পাক খাইতেছে যেন।

বিষণ্ণ চিত্তে সে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল।—উঃ জাতির কি অধোগতি! বিংশ শতাব্দীতেও এই সব কু-সংস্কার বর্ত্তমান। ইহারা থাকিতে জাতীয় শিল্পের কোনদিন উন্নতি হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'জিনিয়াস'দের কথা স্বতন্ত্র। নিউটন গাছ হইতে ফল পড়িতে দেখিয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জ্বলন্ত 'চুল্লীর' উপর ভাতের ডেক্‌চির ঢাকনা উঁচু হইতে দেখিয়া জেম্‌স ওয়াট রেলওয়ে ইঞ্জিনের সন্ধান পান এবং লালাবাবু রজকের গৃহে 'বেলা যায়' শুনিয়া জীবনের ক্ষণিকত্ব সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছিলেন।

ভবানীপুরে ট্রাম হইতে নামিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেই,

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্ট্রি কোং"

ভাসমান সঙ্গীতের মত কয়টি শব্দ সাতকড়ির কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল।

অদূরে কোনও অধ্যয়নরত বালিকা সুর করিয়া পড়িতেছিল 'মা আমার কত ভালবাসেন আমায়'—

উহাই যথেষ্ট। যে মস্তিষ্কে আঁচড়ানো চুল ব্যবসার ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিল—সেই মস্তিষ্ক ওই কয়টি শব্দে মনোজগতে একটা প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন সংঘটন করিল।

সাতকড়ি মৃত মাকড়সাটা 'দুত্তোর' বলিয়া টান মারিয়া পকেট হইতে রাস্তায় নিক্ষেপ করিল।

বাড়ী ফিরিয়া সর্ব্বাগ্রে ঘটা করিয়া মাকে প্রণাম করিতে তিনি অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলেন।

গদগদস্বরে সাতকড়ি বলিয়া ফেলিল, ভেবে দেখলুম, তোমার কথাই ঠিক মা। ঘরে লক্ষ্মী না এলে বাইরের লক্ষ্মীকে হাত করা যায় না।

কিছুদিন পরে। বাসি বিয়ে অর্থাৎ কুশণ্ডিকার দিন—বড় বাজারে 'ইণ্ডিয়ান হেয়ার ইনডাসট্রি কোং'র অফিসে চেয়ার, টেবিল, আলমারী ইত্যাদি অফিস ও গুদাম ভাড়ার জন্য প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইয়া গেল।

'জয় কালী' অপেরার হরিচরণ অধিকারী ৭।৷৹ সেরের বস্তাটা 'গোষ্ঠ লীলায়' পূতনা রাক্ষসীর চুল করিবার অভিপ্রায়ে 'দুই আনা' মূল্যে কিনিয়া লইল।

মেঘদূতের পরিণাম

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় "মেঘদূত"খানা সশব্দে বন্ধ করিয়া কামাক্ষ্যা লাফাইয়া উঠিল। পাশেই বিছানার ওপর কাত হইয়া শুইয়া অনন্ত বি-এ পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করিতেছিল—বিস্ময়ে উঠিয়া বসিল।

—কি রে, ক্ষেপলি না কি?

কামাক্ষ্যা ততক্ষণ চৌকি হইতে নামিয়া পড়িয়াছে। ভাঙ্গা কাপটা হাতে লইয়া বাথরুমের দিকে অগ্রসর হইল।

অনন্ত এইবার সত্যই আশ্চর্য্য হইয়াছে। সবিস্ময়ে বলিল, এত রাত্রে 'সেভ' করবি?

কামাক্ষ্যা হাসিয়া উঠিল। দু'দিনের এই খোঁচা দাড়ি নিয়ে যাব শ্বশুর-বাড়ীতে? এই বুদ্ধি না হলে আর দু'বার বি-এ ফেল করেছিস?

—শ্বশুর বাড়ীতে? এখন?

অনন্ত বই বন্ধ করিয়া টেবিলের নিকট উঠিয়া আসিল।

কি ব্যাপার বলতো?

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্ট্রি কোং"

বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল; সঙ্গে সঙ্গে গুরু গুরু মেঘের গর্জ্জন।

কামাক্ষ্যা কবিত্ব করিয়া জবাব দিল, বিরহী যক্ষের ব্যাকুলতায় হঠাৎ মনের ভিতরটা হু হু করে উঠলো···

—কিন্তু সেখানে গিয়ে বলবি কি? যেতে-যেতেই তো বারোটার কাছাকাছি হবে। হয়ত সবাই তখন ঘুমে অচেতন।

গালে সাবান ঘসিতে ঘসিতে কামাক্ষ্যা বলিল, সে একটা কিছু বলা যাবে। বলবো, ফার্ণ রোডে বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল; রাত হয়ে গেল তাই—

—এখানে এসে আপনাদের বিরক্ত করলাম, এই তো? বউকেও তাই বলবি না কি?

যাঃ—তা কেন? বীণাকে সব খুলেই বলবো;

অর্থাৎ, এ অভিসার মেঘদূতেরই পরিণাম। তুই রাধাকেও হার মানালি। ঠাকুরকে ভাত আনতে বলবো?

—না, না; অনেক দেরী হযে যাবে। ক্ষিদেও নেই বিশেষ।

এটা মিথ্যা কথা। খাইবার অরুচি কামাক্ষ্যার কোন দিনও হয না। বিশেষ করিযা তাহার মতে—মেসের ভাত যত ধ্বংস করা যায় ততই মঙ্গল। মাগ্‌না তো আর দেয না! মাসকাবারে পনেরোটি টাকা নগদ গুণিয়া দিতে হয়।

বন্ধুর এই পরিবর্ত্তনে অনন্তর কৌতুক বোধ করাই স্বাভাবিক।

ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষুর চালাইতে চালাইতে কামাক্ষ্যা বলিল, ট্যাক্সীতেই

যাবো, বড্ড দেরী হয়ে গেল। তা ছাড়া বৃষ্টি থামবে বলে মনে হয় না।

অনন্ত টিপ্পনি কাটিয়া কহিল, বাবা এসে বোধ হয় কিছু দিয়ে গেলেন—তাই এত নবাবী।

টেবিলের উপর রক্ষিত একটা মোটা বইয়ের ভিতর হইতে দশ টাকার নোট বাহির করিয়া কামাক্ষ্যা বলিল, বই কেনার জন্য বুঝলি?

দুই জনেই হাসিয়া উঠিল।

ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে কামাক্ষ্যার বাবা জগদীশবাবু ভবানীপুর হইতে ছেলের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কামাক্ষ্যার মা, ঠাকুরমা, ভাই-বোন সকলে সেখানেই থাকে—বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে। পড়াশুনার সুবিধা হইবে বলিয়া কামাক্ষ্যা হ্যারিসন রোডের এই মেসটাতে উঠিয়া আসিয়াছে। অনন্ত তাহার ক্লাশ-ফ্রেণ্ড। দুইজনেই এই বৎসর বি-এ পরীক্ষায় 'এ্যাপিয়ার' হইবে।

মেসের চাকর গোপাল আসিয়া সংবাদ দিল, ট্যাক্সী আসিয়াছে। কামাক্ষ্যা চুলের ওপর ব্রুশটা আর একবার চালাইয়া লইল; রুমালে সেণ্ট ঢালিল, মুখে স্নো-পাউডার লাগাইল। তারপর অনন্তর পিঠে গোটা তিন চড় মারিয়া শিস্ দিতে দিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

ট্যাক্সীতে উঠিয়া সে মনে মনে মক্স করিয়া লইল, শ্বশুর বাড়ীতে কি জবাব দিবে? নানা দিক চিন্তা করিয়া স্থির করিল—বালিগঞ্জে

নেমন্তন্ন খাইবার কথা বলাই সব দিক দিয়া সুবিধা। বীণাকে বলিবে—তোমার জন্যে রাতটা উপোসী রইলাম, মনের কত টান দেখ।

বীণা মনে মনে নিশ্চয়ই খুব খুশী হইবে ; মুখে কিন্তু বলিবে মোটেই আনন্দ হয় নি। যে চাপা মেয়ে ও!

হয়ত বীণা তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মায়ের ডাকে চোখ কচলাইতে কচলাইতে উঠিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া বলিবে—কি, অতো চ্যাঁচাচ্ছো কেন? তারপর কামাক্ষ্যাকে সামনে দেখিয়া তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবে। ভয়ানক আশ্চর্য্য হইবে বীণা ; খুশীও হইবে খুব।

মা বলিবেন, রুবিকে ওখান থেকে উঠিয়ে আমার ঘরে শুইয়ে দিয়ে আয়। চুণীর জন্যে বিছানা কর। মশারিটাও টাঙাতে হবে।

দরজার আড়াল হইতে চাপা গলায় বীণা রাগের ভান করিয়া বলিবে, আমি বাপু পারবো না ও-সব। রাত্তিরে এসেছে বিরক্ত করতে!

অর্থাৎ বীণা যেন কামাক্ষ্যার আগমন পছন্দ করে নি। মা হাসিবেন। বীণাও তখন মৃদু হাসি চাপিতে পারিবে না। বলিবে ঝঞ্ঝাট যত সব!

তারপর রুবিকে উঠাইয়া পাশের ঘরে শোয়ান হইবে। রাগে গরগর করিতে করিতে মশারিটাও বীণা টাঙাইবে। টাঙাইবার সময় একশোবার কামাক্ষ্যাকে উদ্দেশ করিয়া শুনাইবে—এই গরমে

আমি মশারির মধ্যে পচে মরতে পারবো না। যত সব বদ অভ্যেস —আমাদের তো মশা লাগে না।

কামাক্ষ্যা পাশের ঘর হইতে জবাব দিবে, এ-দিকটা মশা খুব। আমাদের ওদিকে তো মশা একদম নেই—কোন দিনও মশারি ফেলতে হয় না।

মা ও শ্বশুর মহাশয় একথা নিশ্চয়ই সমর্থন করিবেন! মা বলিবেন, ঘরে খাবার জল আছে কি না দেখতো, না থাকে গ্লাসে ভরে রাখ।

মা জানেন, কামাক্ষ্যা রাত্রে জল খায়। একদিন জল না পাইয়া খুব অসুবিধা হইয়াছিল তাহার, এ খবরও তিনি পাইয়াছেন।

এইবার বীণা রীতিমত চটিবে—গ্লাস-ট্লাস সব সকৃড়ি জল রাখা হবে না। খেয়ে শুলেই হয়—এখানে এলেই যত বাড়াবাড়ি—

মেয়ের কাণ্ড দেখিয়া মা না হাসিয়া পারেন না।

—তাই বলে রাত্রে তেষ্টা পেলে খাবে না? যা—ওপর থেকে আলমারী খুলে কাচের গ্লাস বের করে নিয়ে আয়।

বাবাও আদেশ করেন, যা, দেরী করিস নে, রাত অনেক হোলো।

বীণাকে যাইতেই হয়। ওপর হইতে গ্লাস আনিয়া জল ভরিবার পর কামাক্ষ্যা এঘরে উঠিয়া আসিবে—তারপর সুইচ অফ করিয়া আলো নিভাইয়া দিবে।

ট্যাক্সীতে গতি মন্থর হইয়া একস্থানে থামিয়া গেল। হঠাৎ

ঝাঁকানি খাইযা কামাক্ষ্যার চিন্তাজাল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ট্রাফিক পুলিশ হাত উঠাইযাছে। এতক্ষণে ধর্ম্মতলা! রিষ্টওয়াচের দিকে তাকাইযা দেখিল, না, ঠিকই আছে। সাত মিনিট হইযাছে মাত্র। বৃষ্টিও অনেকটা ধরিযা আসিযাছে! যাক, ভালোই হইযাছে। উঃ, মনেই ছিল না কথাটা! বীণা সেদিন একটা সেণ্ট আনিতে বলিয়াছিল। ট্যাক্সীকে অপেক্ষা করিতে বলিযা সে গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টির মধ্যেই নামিয়া পড়িল। নিকটেই একটা দোকান ছিল; সেণ্ট ও এককৌটা পাউডার কিনিযা আনিল এবং ড্রাইভারকে বকশিস কবুল করিয়া জোরে হাঁকাইতে বলিল। তারপর গদিতে হেলান দিয়া আর একবার চোখ বুজিল।

দরজা বন্ধ করা লইযা অনেকক্ষণ বীণার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করিতে হইবে। প্রত্যহই এমন হয়। তাহাদের ও শ্বশুর মহাশয়ের ঘরের মাঝখানে একটি-দরজা আছে। দরজাটা বন্ধ না করিলে ভাল দেখায় না।

কিন্তু বীণা আপত্তি করে—ছিঃ, আমি কি করে বন্ধ করবো? লজ্জা করে না বুঝি? তুমি পুরুষ মানুষ,তোমাব আবার লজ্জা কি?

কামাক্ষ্যাও ওজর তুলিবে—ধ্যেৎ তা কি হয়? তোমাদের বাড়ী, আমি কেন বন্ধ করতে যাবো? আমি এখানে জামাই—

বীণা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিবে, ইস্‌—ভারি তো আমার জামাই! তবে খোলাই থাক্। ভালোই তো, দক্ষিণ দিক দিয়ে হাওয়া আসবে।

কামাক্ষ্যা সুর নামাইয়া অনুনয়-বিনয় করিবে তখন—হাওয়ার দরকার নেই আমার; লক্ষ্মিটি, বন্ধ করে দাও।

বীণা অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিবে। বীণার এই সন্তর্পণে হেলিয়া-দুলিয়া চলিবার ভঙ্গীটি অদ্ভুত লাগে কামাক্ষ্যার কাছে। ভারি সুন্দর দেখায় বীণাকে তখন। ফিরিয়া আসিয়া বীণা বলিবে, হয়েছে তো মশাই? জ্বালাতন করে মারো তুমি।

এর উত্তরে পকেট হইতে সেণ্ট পাউডার বাহির করিয়া কামাক্ষ্যা বীণাকে তাক লাগাইযা দিবে। আদর করিয়া কাছে টানিয়া আনিবে। তারপর কত কথা! ভাবিতে গেলে থেই হারাইয়া যায় যেন। না খাওয়ার জন্য বীণা হয়ত খুব রাগ করিবে, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই। বলিবে, শুধু শুধু আমার জন্যে এই কষ্ট। আজকে না এলেই হোতো। বয়স হয়েছে—তাও তোমার ছেলে-মানুষী গেল না।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবেন বাবু?

কামাক্ষ্যা মুখ বাড়াইয়া দেখিল—রসা রোড পার হইয়া আসিয়াছে। বকৃশিসের লোভে ড্রাইভার খুব জোরেই চালাইয়াছে। সাড়ে এগারোটা বাজেনি এখনো। এমন কি বেশী রাত্তির! গরম কালে লোকে খাওয়া-দাওয়াই করে এমন সময়। বলিল, ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেনস্যান।

বৃষ্টি থামিয়া আকাশে তারা দেখা দিয়াছে। "মেঘদূতের"

আবহাওয়া অনেকটা নষ্ট হইয়া গেল। বাড়ীর সামনে থামিলে চলিবে না—একটু আগেই নামিতে হইবে। ওখানে বলিবে—ট্রামে আসিয়াছে। ল্যান্সডাউন রোডে ট্যাক্সী পৌছিতেই সে ড্রাইভারকে থামিতে বলিল। ট্যাক্সীওয়ালা বাবুকে রাস্তার মোড়ে নামিতে দেখিয়া বিস্মিতই হইল হয়ত! তা হোক। প্রাপ্য ভাড়া ও আট আনা বকশিস দিয়া কামাক্ষ্যা জোরে হাঁটিতে লাগিল। বেশ খানিকটা আগেই থামিয়াছে। এখনো অনেকটা হাঁটিতে হইবে।

দরজার কড়া নাড়িবার পূর্ব্বে কামাক্ষ্যা রুমাল দিয়া মুখটা মুছিয়া লইল। ভাদ্র মাসের যা ভ্যাপ্সা গরম! বৃষ্টি হইয়া বিন্দু-মাত্র তো কমেই নাই—আরও যেন বাড়িয়াছে।

দরজা খুলিয়া দিলেন খুড়ী-শাশুড়ী। তাহাকে দেখিয়া রীতিমত অবাক হইয়া গেলেন। আরে চুণী! এত রাতে কোথা থেকে—হঠাৎ?

কামাক্ষ্যা মুখে হাসি টানিয়া বলিল, বলেন কেন—দুর্ভোগ যত সব। নেমন্তন্ন ছিল বন্ধুর বাড়ী—কিছুতেই ছাড়তে চায় না—রাত হয়ে গেল, তাই—

কাকীমা বলিলেন, ভালোই করেছ এসে। এত রাতে মেসে গিয়ে চেঁচামেচি করতে হোতো তো? তোমার কাকাও আজ সকালে এসেছেন। বৃষ্টিতে ভিজেছো না কি?

—না, ট্রামেই এলাম। বৃষ্টি আর নেই এখন। কাকা কি এলাহাবাদ থেকেই এলেন?

কাকীমা বলিলেন, হাঁা, একটা কাজে এসেছেন। ছু'দিন থাকবেন।

বাইরে বসিবার ঘরেই কথাবার্ত্তা হইতেছিল। ইতিমধ্যে অন্দর-মহলে সংবাদ পৌছাইয়াছে! শ্বশুর মহাশয় ও শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ ছুজনেই হাজির হইলেন। শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, কী ব্যাপার? এই দুর্য্যোগের ভিতর—খাওয়া-দাওয়া হয় নি নিশ্চয়ই। আমরা এইমাত্র খেয়ে উঠছি—যাক্‌, অসুবিধে হবে না। ঠাকুরকে বলে দিক তবে। ওরে—ও হরি—

মহা ব্যস্ত হইয়া তিনি হাঁকডাক সুরু করিলেন।

কামাক্ষ্যা প্রবল আপত্তি করিয়া বলিল, না, না—এইমাত্র পেট-ভর্ত্তি মাংস-পোলাও খেয়ে ফিরছি। বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল। সন্ধ্যে ছ'টায় এসেছিলাম, এখন ছাড়া পেলাম।

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, সে কি কথা? তোমার বাবা যে এইমাত্র এখান থেকে খেয়ে গেলেন। তিনি নাকি তোমার সঙ্গে ন'টা সাড়ে-ন'টায় দেখা করেছিলেন?

সর্ব্বনাশ! কামাক্ষ্যা প্রমাদ গণিল। এইরূপ হাতে-হাতে ধরা পড়িবে তা কি করিয়া বুঝিবে সে? বাবাই বা হঠাৎ আজ এখানে পদধূলি দিতে আসিলেন কেন? সে যেন আকাশ হইতে পড়িল।

—তাই নাকি? বাবা সাড়ে নটায় আবার গিয়েছিলেন আমার ওখানে? আমি তো তাঁর সঙ্গে গল্প করে পৌনে ছু'টোয়

মেস থেকে রওযানা হই। তবে বোধ হয় অনন্তর সঙ্গে দেখা হয়ে থাকবে।

শ্বশুর মহাশয অতটা তলাইযা দেখিলেন না। বলিলেন, তা হবে হয়ত, কোন কাজ ছিল; তোমার বাবা যা তাড়াতাড়ি কথা বলেন—ভুল করে অনন্তর পরিবর্ত্তে তোমার নাম করে বসবেন—সে আর বিচিত্র কি!

কামাক্ষ্যা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। খুব বাঁচিযা গিযাছে।

পুনরায় দরজার কড়া নাড়িবার শব্দ হইল। কাকীমা উঠিযা দরজা খুলিযা দিলেন। এলাহাবাদের যোগেশ কাকা। কামাক্ষ্যা উঠিয়া প্রণাম করিল।

কেমন আছেন কাকা?

যোগেশকাকার মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিযা উঠিল। বলিলেন, এই যে একটু আগেই ধর্ম্মতলার মোড়ে দেখলাম! একটা দোকান থেকে জিনিষ কিনে বেরিয়ে আসছিলে!

শ্বশুর মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন।

—তোর চোখ খারাপ হযেছে দেখছি। ওকে ধর্ম্মতলায দেখবি কি করে? ও তো ফার্ণ রোড থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছে।

কামাক্ষ্যা ফ্যানের নীচে ঘামিয়া উঠিযাছে। হাসিবার চেষ্টা করিল,—আপনার ভুল হয়েছে কাকা। অন্য কাউকেও দেখে থাকবেন।

মেঘদূতের পরিণাম

যোগেশকাকা বারবার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, অসম্ভব! আমি স্পষ্ট দেখলাম—তুমি দোকান থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সীতে এসে বসলে। ছাইরঙের সিডানবডী ট্যাক্সী—বাঙালী ড্রাইভার, গায়ে খাকী হাফ সার্ট—ঠিক ফলের দোকানগুলোর সামনে—

এই রে, হুবহু মিলিয়া যাইতেছে। কামাক্ষ্যা মরিয়া হইয়া অস্বীকার করিল, তা কি করে হয়? আপনি বোধ হয় আমার মত অন্য কাউকেও দেখে থাকবেন। বেশ মজা হয়েছে কিন্তু—

সকলে একবাক্যে সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিল। যোগেশ নিশ্চয়ই অন্য কাহাকেও দেখিয়াছে যার চেহারার সঙ্গে চুনীর খুব মিল আছে।

যোগেশ-কাকা নিরুপায় হইয়া তাহাই স্বীকার করিয়া লইলেন —তাই হবে তা হলে। কিন্তু এমন আশ্চর্য্য মিল যমজ ভাই ছাড়া খুঁজে পাওয়া দুষ্কর—অ-বি-কল চুনীর চেহারা।

কথাটার এইখানেই পরিসমাপ্তি হইল। কামাক্ষ্যা ভাবিতেছিল, আজ সকালে কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে সে। ভগবানকে ধন্যবাদ, এ-যাত্রা বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন তিনি। বীণা নিশ্চয়ই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এতক্ষণ; কিংবা, হয়ত তারই প্রতীক্ষায় বিরক্ত হইয়া বসিয়া আছে। শ্বশুর বাড়ীতে আসিলে এইটাই বিশ্রী লাগে —ইহারা গল্প পাইলে আর ছাড়িতে চায় না।

“অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্ট্রি কোং”

কাকীমা বলিলেন, খাওয়ার পাট নেই যখন, হরি বাইরের ঘরে বিছানা করে দিক—

বাইরের ঘরে? কামাক্ষ্যার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইল।

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, তুমি আসবে কেউ ত জানে না। বীণা আজই বিকেলে তার পিসীমার বাড়ীতে বেড়াতে গেলো। পরশু আসবে।

"বেয়ারিংএর ব্যথা"

—টুপ্—

কে ?

আমি থাম।—আপনি ?

আর কেউ আছে ? না আপনি একা ?

আছে, আমি এসে দেখি একখানা বেষারিং।

জিজ্ঞেস্ করলাম—কোন উত্তর পাইনি। বেচারী হয়ত খুব দুঃখ পেয়েছে। কি সংবাদ আছে—ওই জানে। যাক্‌গে। আপনি কোথায় ?

দেওঘর। আপনি ?

আমি ? সে কথা আর বলবেন না। বেনারসেই। ওই যে শিবালয়ে লাল তেতলা বাড়ীটা আছে—ওখানে থেকে এসেছি। বাবু কোলকাতায় থাকেন। আজ নতুন এখানে এলেন। কোন এক পরিচিত বন্ধু থাকেন দশাশ্বমেধে—তাকে খবর দিতে যাচ্ছি। কিন্তু—ও এখনও এলো না।

কে ?

আমরা দুজনে এতক্ষণ বাবুর টেবিলের ওপরই ছিলাম। বাবু

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্ট্রি কোং"

—খবরটা জরুরি বলে আমাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বল্লেন, ছবিকে একটু দেরীতে লিখলেই হ'বে। বোধ হয় ওকে এ ডাকে দেবেন না।

হুঁ। দিলে ত এতক্ষণ এসে পৌছুবার কথা। একটা বাজে বোধ হয়।

শুনছেন ?

কে ? বেযারিং ? বলুন—কি বলবেন !

আপনারা ক'জন ?

দু'জন। আমি আর পোষ্টকার্ড।

সময কত বলতে পারেন ?

এখন ? clearanceএর মিনিট দশ দেরী আছে বোধ হয। কেন বলুন তো ?

—টুপ্—

কে ?

আমি ভাই।

ওঃ—পোষ্টকার্ড। কোথায পাঠালেন বাবু ? সে কথা বল্‌তে —লজ্জায় আমারই মাথা কাটা যাচ্ছে। উঃ—মানুষগুলো কি জঘন্য। বাইরের খোলস দেখে ভেতরটা একদম বোঝা যায় না তখন বাবু—ছবির নাম কোরলেন না ? সেই ছবি কে জানো ?

আমি জানবো কি করে ? কে বলতো ? দেহ ব্যবসায়ী—পতিতা ! কোলকাতার এক ঘৃণিত পল্লীতে থাকে। তাকে

এক্ষুণি আস্‌তে হবে বাবুর চিত্তবিনোদন করতে। এবং এই সুসংবাদটা আমাদের মত হতভাগ্য ছাড়া কে বইবে বল?

কিন্তু লজ্জা সরমের মাথাও কি তিনি খেয়েছেন? চিঠিটা খামে দিলেই পারতেন।

সে দিকে আটঘাট্ ঠিক বেঁধেছেন।

পরম কল্যাণীয়া ছবি—তুমি পত্র পাঠ মাত্র চলে আসবে। আমি মরণাপন্ন কাতর। আসবার খরচ পাঠালাম। জিনিষ-পত্তর আনবার কোন দরকার নেই। ইতি আশীর্ব্বাদক—শ্রীআশীষ ঘটক। এ দেখে—সন্দেহ কে করবে বল?

আজকে আমাদের দল এত পাৎলা কেন? পিয়নেরও ত আসার সময় উৎরে যাচ্ছে। কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

শুনছেন?

ওঃ—বেয়ারিং। কি বলুন!

আজ এখন ডাক যাবে না! রবিবার। যাক্ বাঁচালে ভাই তুমি। ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম অন্ততঃ কপালে আছে।

দেওঘর কোথায় যাবেন?

পুরণদহ।

—কি, ভাল খবর?

আমার?—না ভাল না মন্দ! সেই একটানা অভাবের সুর। বাবা—অনেকদিন চিঠি পাই নি। খরচের টাকা নেই। খোকার অসুখ। খেঁদার কদিন হ'ল পিঠে একটা ফোড়া হয়েছে। আমার

শরীর ভাল না, Examineএ পাশ করেছি। এবার fees জমা দিতে হ'বে। এই Februaryর ফোর্থ last date। পাঁচু তেলী রোজ বাড়ী ভাড়ার জন্য তাগাদা দেয়। দুধের দাম কার্ত্তিক থেকে বাকী। আপনার শরীর কেমন? পত্রপাঠ কিছু টাকা অবশ্য অবশ্য পাঠাইবেন। ইতি। আপনার স্নেহের "তারু"।

শুনছেন?

ওঃ—বেযারিং! কি বল।

আমি আপনাদের আলাপে যোগ দিতে পারছি না বলে—খুব দুঃখিত। কথা বলবার শক্তি অবধি হারিয়েছি। উঃ, ভাবতেও আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে—

—টুপ্—

কে? কে?

আমি। শুভবিবাহ। আপনারা ক'জন?

শুভ বিবাহ?—আসুন—আসুন। আজ আমাদের সব খারাপ খবর। আপনি মনকে একটু চাঙ্গা করে দিন। বিয়েটা কার?

—এই ধীরেন চৌধুরীর মেযের। পাত্রও এখানে থাকে। Hindu universityতে সেকেণ্ড ইযারে পড়ে।—বিজয গুপ্ত।

মেয়ের লেখাপড়া কদ্দূর?

মেযে—ঐ কলেজেই—ফার্ষ্ট ইয়ার অবধি পড়েছে। তারপর —দু'একটা কথাবার্ত্তা—একটু মুচকি হাসি থেকে চিঠি পত্র পর্য্যন্ত

আদান প্রদান হয়। দু'পক্ষেরই সম্মতি। অতএব শুভস্য শীঘ্রং। মেয়ে খুব সুন্দরী।

তা হ'লে courtship—বলুন। মেয়ের নাম কি?

তার নাম বেশ artistic। হিমেলা চৌধুরী। তবে পাত্রের নাম—গরমী গুপ্ত রাখলেই হ'ত। যা বলেছেন। যা choice আজকালকার সব।

বিয়েটা কবে?

আস্‌ছে মাসে। অনেক লোকজন নিমন্ত্রিত হ'বে। সেই জন্যে আগে থেকেই—

টুপ

কে?

আমি খাম।

কোথায়?

এলাহাবাদ।

কি খবর? ভাল?

ভাল বলে ভাল,—প্রেয়সীর প্রেমপত্র।

তাই নাকি? শুনি—শুনি—

বাপ্‌স। প্রেমের নামেঁ যে সবাই ক্ষেপে উঠ্‌লেন?

কি আর করি বলুন! মানুষের একঘেয়েঁ জীবন—প্রেমকে আশ্রয় করেই ত বেঁচে আছে। ওটা বাদ দিলে—মানুষের অস্তিত্বই থাকে না। আমাদের শুনেই আনন্দ।

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্ট্রি কোং"

শুনুন তবে,—

প্রিয—তোমার সেদিনকার কথা এখনও ভুলতে পারছি না। আমাদের স্কুল আজ বন্ধ হ'লো তোমাকে ছেড়ে আমি থাকবো কি করে? তুমি এখানে এসে আমার প্রাইভেট্ টিউটর হও। বাবার মত করেছি। একটু বুড়োর 'make up' করতে হ'বে। তা হোক্। কষ্ট স্বীকার না করলে মিলন হওয়া অসম্ভব। বাজারে crepe hair পাওয়া যায়। তাই কিনো। কবে পড়াতে এসে আমাকে আলিঙ্গন করবে—সেই সুখস্বপ্ন দেখ্‌ছি। ইতি তোমার "সুচিকণা"

বাঃ বাঃ এত তোফা plan। Make up করে private tutor সেজে—প্রেম। Guardianরা সাবধান। বুড়ো মাষ্টার দেখলে—নিদেন দাড়ি গোঁফটা একটু নেড়ে চেড়ে দেখা উচিত। যা দিন কাল।

হাঃ—হাঃ—হোঃ—হোঃ—হিঃ—হিঃ—।

শুনছেন?

কে বেযারিং?—বল—বল—কি বলবে?

নগেন বাগচীকে চেনেন?—নগেন বাগচী? Martineএ কাজ করে।

নাম শুনেছি।

সেই নগেন বাগচীর পরিবার—মির্জ্জাপুরে থাকে, তার বাপের বাড়ীতে।

"বেয়ারিংএর ব্যথা"

গত বছর বিয়ে হয়েছে। এইখানেই পাঁড়ে হাউলাতে একখানা ঘর নিয়ে থাকতো। এই সেদিন ছেলে হ'বার জন্য বাপের বাড়ী গেল!

হুঁ। তার পর।

আজ নগেনবাবু ক'টা টাকা ধার করতে বেরিয়েছিলেন, আস্‌ছে—শনিবার মির্জ্জাপুর যাবেন।

বেলা ন'টার সময় পাগলের মত রাস্তায় টো টো ক'রে ঘুরছিলেন। হঠাৎ একটা বাসের তলায় পড়লেন। চাকাটা বুকের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠান হ'ল। আধঘণ্টা পরেই মারা গেলেন।

আপনি কি তবে হাসপাতাল থেকে আসছেন? না। নগেন বাবুর বাড়ীতে এক ভাড়াটে আমাকে পাঠালেন! সেও গরীব। তবে নগেন বাবুর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল।

মানুষের কপাল! কখন কি হয়! সে তো ঠিক! কিন্তু এই নিদারুণ বৈধব্যের সংবাদ কি করে আমি তাদের দোবো—তাই ভাবছি। উঃ—কাল বিকালেও নগেনবাবু পরিবারের চিঠি পেয়েছেন, তাতে কত ভালবাসার কথা—আসবার জন্য ব্যগ্র প্রার্থনা।—আর আজ?—

কেঁদে আর কি করবে বল। সবই নিয়তি।

—খুট্‌—খট্‌—খটাস্‌—

চুপ—চুপ—ওই পিয়ন এসেছে।

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্‌ট্রি কোং"

Letter Box খুলিয়া পিয়ন নিয়মিত চিঠি লইয়া চলিয়া গেল।

ক' ঘণ্টারই বা আলাপ! তাহার পরই ত ছাড়াছাড়ি।

—দেওঘর—মির্জ্জাপুর—এলাহাবাদ—কলিকাতা—

তবু,

মানুষের দুঃখে এরা কাঁদে। সুখে আমোদ করে।

—সামান্য—খাম—পোষ্টকার্ড—বেয়ারিং।

রীতিমত সমস্যা

নক্সা

বিবাহের পাকাপাকি বন্দোবস্ত ঠিক হইবামাত্র কড়িরাম অতি মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বাড়ীতে মাথার ওপর বাবা মা বর্ত্তমান —দূরসম্পর্কীয় পিসী মাসীরও অভাব নাই, তা ছাড়া কয়েকজন দাসদাসীর খরচ বহন করিবার মত স্বচ্ছল অবস্থা তাহাদের আছে। সুতরাং ব্যস্ততাটা যে বিবাহের মত এত বড় একটা বিরাট্ কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার দুর্ভাবনা নয়, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত।

আসল ব্যাপার তাহাকে রিহার্সাল দিতে হইবে। সময় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, মাত্র দশটি দিন হাতে আছে। রিহার্সালের বিষয় শুনিলে আপনারা হয়তো হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু কড়িরামের এ সব দিকে অভিজ্ঞতা অত্যন্ত কম—নাই বলিলেও চলে। সুতরাং তাহার নিকট ইহা যে জটিল সমস্যারূপে দেখা দিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

ফুলশয্যার রাত্রে নববধূর সহিত সে প্রথম কি কথা বলিবে, ইহা হাজার রকমে ভাবিয়াও এ পর্য্যন্ত একটা স্থির সিদ্ধান্তে

উপনীত হইতে পারিল না। বি-এ-তে তাহার ইকনমিক্স ছিল। ছাত্রদের নিকট যে 'পেপার' সর্ব্বাপেক্ষা ভীতিপ্রদ—সেই 'ইণ্ডিয়ান্ কারেন্সী' ও 'ব্যাঙ্কিং' পেপারে সে একশতর মধ্যে আশী নম্বর পাইযা নিজের উর্ব্বর মস্তিষ্কের জন্ম অধ্যাপকদের নিকট যথেষ্ট তারিফ পাইযাছে। কিন্তু ফুলশয্যায একটি অপরিচিতা তরুণীকে কি বলিযা প্রথম সম্ভাষণ করা যায এবং সেটা ঠিক বিংশ শতাব্দীব চাল-দুরস্ত হইবে কি না—ইহা তাহার নিকট সত্যই দুর্ব্বোধ্য মনে হইল।

এ সব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বন্ধুর শরণাপন্ন হওযা ভিন্ন গত্যন্তব নাই। বিবাহিত বন্ধুব সংখ্যা তাহাব নিতান্ত অল্প নহে—তাঁহাদের দ্বারস্থ হওযাই কডিরামের সব দিক দিযা সমীচীন বোধ হইল। সে স্থির করিল বন্ধুদের সেই সব বিবৃতি নোট কবিযা লইবে এবং শেষে তাহা হইতে একটা ভাল দেখিযা নির্ব্বাচন করিলেই আপাততঃ বিপদ হইতে উদ্ধাব পাওযা যাইতে পাবে।

আশীষবাবু মার্চ্চেণ্ট অফিসেব কেরাণী। তাঁহাব চারিটী সন্তান—বযসে কড়িরামের ডবল্ অর্থাৎ চল্লিশ পার হইযাছে। তাহা হইলেও তিনি বযসের মাপকাঠিতে সব জিনিয বিচার করিযা চলেন না। তাঁহার মতে কুড়ি অতিক্রম করিলে সকলে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয—কড়িরামকে তিনি বেশ আমল দিতেন। খবরটা শুনিয়া প্রথমে একদফা 'কন্‌গ্রেচুলেট' করিলেন। পরে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িযা বলিলেন,

রীতিমত সমস্যা

আমাদের সময়ে ভাই অন্য রকম ছিল, তা কি তোমাদের পছন্দ হবে। আমি প্রথমে তোমার বৌদির নাম জিজ্ঞেস্ করলাম—তারপর বোল্লাম—

—কি পড়ো? ওঁর তখন দশ বৎসর কি না—কড়িরাম দু' এক কথার পর বিদায় লইল।

অমর সমবয়সী, তবে ঠিক আপ্-টু-ডেট্ নয়। 'বণিকের' বংশ। নিজেরও শ্যামবাজারে প্রকাণ্ড মুদিখানার দোকান আছে। স্কুলে এক ক্লাসে পড়িত—সেই সূত্রে আলাপ। বলিল,

আমাকে প্রথমে ও প্রণাম করে। আমি আশীর্ব্বাদ করে বোল্লাম,

মা মারা যাবার পর তুমিই এখন এ বাড়ীর গিন্নী হ'লে—একটু বুঝে সুঝে খরচপত্র কোরো।

কড়িরামের মনটা খারাপ হইয়া গেল।

কান্তির 'এ্যারিস্‌ট্রোক্রেট' বলিয়া খ্যাতি আছে, তার ওপর সে কবি। বালীগঞ্জে ফার্ন রোডে থাকে। গত বৎসর বিবাহ হয় এবং এ বৎসর একটি মেয়ে হইয়াছে। কড়িরামকে খুব সমাদর করিল। চা-পানের পর কড়িরাম সব কথা খুলিয়া বলিল।

কান্তি হাসিয়াই খুন—এই ব্যাপার! তা ভাই আমরা কবি মানুষ, আমাদের কথা আলাদা।

কড়িরাম অনুরোধ করিল,

বল্ না—প্রথমে কি বলেছিলি?

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্‌ট্রি কোং"

কান্তি গর্ব্বের সহিত বলিল,

আমার 'ফার্ষ্ট' সেন্‌টেন্স'—

জীবন সুতোয নাম না জানা দু'টো ফুল বিধাতা পুরুষ আজ এক সঙ্গে গেঁথে দিলেন—দেখো যেন খসে পড়ো না।

কড়িরাম নোট করিয়া প্রস্থান করিল।

সাতকড়ি কবিরাজের ছেলে। খুব সরল এবং মিশুক। বলিল,

জানিস তো ওর মাযের খুব অসুখ ছিল। আমি দরজা বন্ধ করে বল্লাম,

তোমার মার অসুখ কতদিন হ'ল? কড়িরাম সুনীলের কাছে গেল। তার বাবা জমিদার—চার বৎসর বিবাহ হইযাছে। প্রথমে লজ্জায কিছু বলিতে চাহিল না; শেষে কড়িরামের পীড়াপীড়িতে বলিল, বিযেতে দেশ থেকে অনেক মুসলমান প্রজা এসেছিল। আমি ওঁকে প্রথমেই বল্লাম, প্রজারা তোমাকে অনেকে নজর দিযেছে না? মাসখানেক পরে আমার সঙ্গে মহালে নিযে যাব।

বাধ্য হইয়া নোট করিতে হইল। কিন্তু কড়িরামের কোনটাই মনঃপুত হইতেছে না।

শম্ভু খুব কালো, বিবাহ হইযাছে অনিন্দ্য সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে—ভাগ্য ইহাকেই বলে।

কড়িরামের প্রশ্নে গদ গদ হইযা বলিল, যা বলেছি শুনলে হয়তো ঠাট্টা করবে, কিন্তু এ ছাড়া ওকে কোনও কথা বললে আমি স্বস্তি পেতাম না।

রীতিমত সমস্যা

কড়িরাম বলিল, ভনিতা কয়তে হবে না। বলে' ফ্যাল্‌—।

শম্ভু বলিল, খানিকটা নিঃশব্দে কাট্‌ল। হঠাৎ আবেগের মাথায় আমি ওর হাত ধ'রে বল্লাম, আমি তোমার নিতান্তই অযোগ্য। তোমার ভালবাসা থেকে এ অভাগাকে বঞ্চিত কোরো না। এত দুঃখেও কড়িরাম না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

বিবাহের আর তিন দিন মাত্র বাকী আছে। সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে—যাহা হয় হইবে। এ নিয়ে আর মাথা ঘামানো চলে না। বন্ধুদের একটা কথাও তার মনে লাগে নাই। ভাবী পত্নী ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে—যা তা বলিয়া শেষে কি নিজের মান সম্ভ্রম নষ্ট করিবে? ভাগ্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

অবশেষে বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। সে দিন নিজের কিছুই করিবার নাই বলিয়াই রক্ষা। যন্ত্রচালিতের মত আচার অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল, প্রতিবাদ করিবার প্রথা নাই। সুতা দিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাপিবার সময় তাহার কানটা সাধারণের তুলনায় লম্বা বলিয়া অনেকে 'গাধা' 'গাধা' বলিয়া ঠাট্টা সুরু করিল, মর্দ্দনও বাদ পড়িল না। ইহাও মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইল।

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়া গেল। তারপর বাসর ঘর। এখানেও বিশেষ অসুবিধা হইল না—কারণ শালা শালী ইত্যাদিতে ঘর ভর্ত্তি। ভীড়ের মধ্যে তাহার ভালই লাগে—নিজের বিশেষ কিছুই করিতে হয় না—প্রশ্নের দু'একটা কাটা ছাঁটা জবাব দিলেই হইল।

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্ট্রি কোং"

নেক্স্ট ষ্টেজ্ ফুলশয্যা অর্থাৎ কড়িরামের অগ্নি-পরীক্ষা। সকাল হইতে প্যাল্পিটেশন্ সুরু হইয়াছে। অনেক রকম কথা জট্ পাকাইয়া মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার দিকে তুমুল বেগে দুই ঘণ্টা বৃষ্টি হইয়া রাস্তায় হাঁটু অবধি জল দাঁড়াইয়া গেল। সে আরামের নিশ্বাস ফেলিল। তবু বলবার একটা কথা পাওয়া গেল—বোধ হয় সময়োপযোগী নেহাৎ বেখাপ্পা হইবে না।

কী বৃষ্টিটাই আজ হ'ল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে যে এতটা বোকা বনিয়া যাইবে, ইহা তাহার ধারণার অতীত ছিল। চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। ম্যাট্রিক পাশ মেয়ের নিকট সত্যিই সে ঠকিয়া গিয়াছে।

দরজাটা আস্তে বন্ধ করিতেই নব বধু রঙ্গিণী ওরফে রিঙ্গী কড়িরামের মুখের কাছে সরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, আজকের খেলার রেজাল্ট কি বলতে পার? কণ্ঠস্বরে কি উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা। কড়িরাম বোকার মত 'না' বলিল।

ফুলশয্যার নবীন আনন্দের মধ্যে মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং-এর চ্যারিটি ম্যাচের যে কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

যুগ ধর্ম্ম

বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টা ধাপ কৃতিত্বের সঙ্গে ডিঙ্গাইয়া আসিয়া বিন্ধ্যবাসিনী দিশেহারা হইয়া পড়িল। তাই ত—এত দিন বইয়ের পোকা হইয়া ঘরে বসিয়া সে অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছে। বহির্জগতের কোন খবরই সে রাখে না, এ কয় বৎসরে আমূল পরিবর্ত্তন হইযাছে সব বিষয়ের। পুরাতন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা করিতে গিযা সে অপদস্থের একশেষ হইল।

এম্-এ-তে প্রথম হইযা স্বর্ণপদক পাইযাছে এ কথাটা কেহই ততটা আমল দিল না। রিণি মৌখিক একটু তারিফ করিয়া প্রশ্ন করিল—" 'অভিনয়' কেমন দেখলি বল ?"

ম্যাট্রিক পাশের পর বিন্ধ্যবাসিনী অধ্যয়নকেই একমাত্র তপস্যা বলিযা গ্রহণ করিয়াছিল সুতরাং বায়স্কোপ দেখার প্রয়োজন বোধ করে নাই। বলিল, "অভিনয় আবার কি ? অনেকদিন ভাই থিয়েটার দেখিনি।"

বন্ধুর এই অজ্ঞতায় রিণি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার উপক্রম হইল। ঘর ভর্ত্তি লোকের সামনে বিন্ধ্যবাসিনীর এই উত্তর যেন তাহার নিজেরই অপরাধ বলিয়া মনে হইল। অন্যান্য

সকলেরও চক্ষু স্থির! সে কি কথা? ভারতলক্ষ্মীর 'অভিনয়' দেখেন নি? থিয়েটার নয় film! সাধনা বোসের unparallel acting!"

বিন্ধ্যবাসিনী অপ্রস্তুত হইয়া বলিল "সাধনা বোসের নাম ত শুনিনি। খুব ভাল play করেন বুঝি?

এই মুহূর্ত্তে বজ্রপাত হইলেও বোধ হয় তরুণীবৃন্দ সেরূপ আশ্চর্য্য হইত না! অবাক হইয়া সকলে বিন্ধ্যবাসিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল—এম্‌-এ পাশ করিয়াছে—সাধনা বোসের নাম জানে না—এ কথা শেষকালে কানে শুনিতে হইল? তার আগে ধরণী বিদীর্ণ হইল না কেন?

অবশেষে সকলের পীড়াপীড়িতে সে স্বীকার করিল যে টকির মধ্যে পিসীমার সঙ্গে একবার মাত্র "প্রহ্লাদ" দেখিয়াছিলাম। তারপর পড়াশুনার চাপে আর দেখা ঘটিয়া উঠে নাই। তরুণীগণ একবাক্যে উপদেশ দিল "আমাদের কাছে বল্লেন ক্ষতি নেই, কিন্তু বাহিরে ভুলেও উচ্চারণ করবেন না যেন।"

পরদিন সন্ধ্যায় বাল্যবন্ধু মাতঙ্গিনীর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া বিন্ধ্যবাসিনী শুনিল—সে কাকার সঙ্গে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে 'বন্দে-মাতরমের' প্রতিবাদ সভায় যোগদান করিতে গিয়াছে, এখনই ফিরিবে। মাতঙ্গিনীর মাকে সে মাসিমা বলিত—তিনি আদর করিয়া বসাইলেন। 'অনেকদিন তোমাকে দেখিনি মা! ভাল ছিলে তো?"

যুগ ধর্ম্ম

বিন্ধ্যবাসিনী পরীক্ষার অজুহাত দিয়া বলিল—"এইবার শেষ হলো মাসিমা—এম-এ পাস করলাম।"

মাসিমার নিকট সংবাদটা প্রীতিকর মনে হইল না। বলিলেন—"পড়াশুনা করে আর কি হবে? দেশের যা অবস্থা, শেষকালে 'বন্দেমাতরম্' গানও কিনা ছাঁটতে হলো।"

মাতঙ্গিনী বার দুই ম্যাট্রিক ফেল করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে দেশের কাজে যোগদান করিযাছে। সেই কথা উল্লেখ করিয়া মাসিমা বলিলেন—"মাতুর কি আর মরবার ফুরসৎ আছে? দেশের জন্যে ওর খাটুনীর অন্ত নেই—কাগজে দেখনি আজকের? —ওর ছবি বেরিয়েছে—কত সুখ্যাতি—"

বিন্ধ্যবাসিনী কাগজ পড়ে না, তবু এ সত্য কথাটা বলিতে কেমন বাধিল, বলিল—"পড়বার সময় পাই নি, রাত্রে দেখবো।"

মাসিমা বলিলেন—"দেখো—খুব লিখেছে—। ও তো প্রায় লীডার হতে চলেছে বল্লেই হয।"

"বাড়ীতে প্রায় সব রকম কাগজই আসে। ভাই বোনের কাগজ পড়ার খুব সখ। ঘুম থেকে উঠেই কাগজ নিয়ে বসা চাই।"

অদূরে একটা বড় কাঠের দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিলেন—"ওই বাক্সটার মধ্যে সব বড় বড় খবরের কাটিং জমা আছে। সুভাষ বাবুকে যেদিন প্রথম ধরে—গান্ধী কবে প্রথম মাংস খায—জহরলাল বিলেতে কি রংযের সুট পরতো—সব পাবে।"

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্ট্রি কোং"

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বন্দেমাতরমের প্রতিবাদ সভা হয় নাই। পুলিশ আসিয়া যষ্ঠী প্রহারে সকলকে ভাগাইয়া দিয়াছে। মাতঙ্গিনী ও সুবিমল হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাজির হইল।

"Oh God! বিন্দু যে! অনেক দিন পরে—"

মাতঙ্গিনী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"আজকের কাগজে দেখে বুঝি? খুব লিখেছে না?"

বিন্ধ্যবাসিনী হ্যাঁ-না কিছুই বলিল না।

মাতঙ্গিনী বলিল,—"এই আমার কাকা সুবিমল। আমার বাল্যবন্ধু মিস্ বিন্ধ্যবাসিনী দত্ত"—নমস্কার বিনিময় হইল।

বিন্ধ্যবাসিনীর মনে হইল এম-এ-তে প্রথম হইয়াছে এ সংবাদ কাগজের এক কোণে বাহির হইয়াছিল।

মাতঙ্গিনী সভা সমিতি করে বলিয়া কাগজের প্রধান পৃষ্ঠায় বড় বড় হেডিংএ সে সংবাদ প্রকাশিত হয়। অদৃষ্টই বটে। তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। জীবনটাই নষ্ট করিয়াছে পড়াশুনা করিয়া।

সুবিমল তাহাকে লক্ষ করিয়া বলিল—"হিটলারের কাণ্ডটা দেখেছেন? কিন্তু এ কি বেশী দিন চলবে আপনার মনে হয়?"

বিন্ধ্যবাসিনী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল—"বোধহয় না।"

এখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিলে অপদস্থের সীমা থাকিবে না—সরিয়া পড়াই ভাল।

যুগ ধর্ম্ম

জরুরী কাজ আছে—অন্য একদিন আসিবে বলিয়া সে রাজনীতির কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

পাড়াতে একটা সাহিত্য সভার অধিবেশন হইবে—সকালে কয়েকজন তরুণী বিন্ধ্যবাসিনীকে বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। তাহাকে একটা লেখাও পড়িতে হইবে। সে একটা প্রবন্ধ পড়িতে রাজী হইয়াছে।

সন্ধ্যা ৬॥টায় সাহিত্য সভার অধিবেশন সুরু হইল। বিন্ধ্যবাসিনী লক্ষ্য করিল, সভায় সাহিত্যের খোরাক থাক না থাক—নাচ গানের প্রাচুর্য্য অত্যন্ত বেশী। ছোট বড় মেয়ে নানা ভঙ্গিতে নাচিতেছে।—প্রোগ্রামে দেখিল—নাচগুলির বিচিত্র সব নাম।—"আমাতে তোমাতে, তোমাতে আমাতে"—"হিমেলী রাতের কুয়াশা" "নব বসন্তের পবন হিল্লোল"—ইত্যাদি—

সে কোনদিন এ সবের নাম শুনে নি। শুধু মেয়ে নয়—দু' একজন ছেলেও আছে। ছেলেটি "নটরাণ্ডব নাচিল। লম্ফে—ঝম্ফে ষ্টেজ ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম।

তারপর তার প্রবন্ধের ডাক আসিল। সে মনে করিয়াছিল—প্রবন্ধটির সুখ্যাতি সকলেই করিবে কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলেই স্বীকার করিয়াছিল এইরূপ সুচিন্তিত প্রবন্ধ অত্যন্ত বিরল।

প্রবন্ধটির নাম—"কার্ল মার্ক্স ও তাহার মতবাদ" কিন্তু প্রবন্ধের

সময় অনেকেই উঠিয়া বাহির হইয়া বাগানে বেড়াইতে লাগিল। সভাপতির উঠিবার উপায় নাই তিনিও চেয়ারে বসিয়া উসখুস করিতে লাগিলেন। শেষ হইলে হাত তালি পড়িল বটে—কিন্তু সে যেন হাঁফ ছাড়ার হাততালি। না পড়িলেই সে সুখী হইত।

এর পর আধুনিক সাহিত্যিকদের গল্প। গল্পের বিষয়বস্তু বলিয়া কোন বালাই নাই। প্রায়ই সেক্স সম্বন্ধীয়; নামও সব অদ্ভুত—জীবন সেদিন মাতল আমার মরণ বিহারে—" "প্রিয়া ও টিকটিকি—" "হঠাৎ আলোর ছলকানি—" ইত্যাদি। ভাষার ও ব্যাকরণ বলিয়া কোন বালাই নাই। যে যা পারিয়াছে লিখিয়াছে। যেন লিখিলেই সাহিত্য হইল।

সভাপতি মহাশয় তাঁর অভিভাষণে "প্রিয়া ও টিকটিকি" গল্পটির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

টিকটিকির সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে পোকা ধরিতে যাওয়ার সঙ্গে প্রিয়ার—কম্পিত হিয়া দুরুদুরু বক্ষে মন্থর গতিতে প্রেমাস্পদের নিকট মিলনাকাঙ্ক্ষার যে ছবিটি লেখক আঁকিয়াছেন তা সত্যই অপূর্ব্ব। তারপর প্রশংসা করিলেন আধুনিক লেখকদের—লেখার তেজস্বী ভঙ্গীর। প্রত্যেকটি লেখাই জ্বলন্ত—আগুনের মতন কোন বাঁধা ধরা নিয়ম এরা মানবে না—সব কিছুর বিরুদ্ধেই এরা চালাবে বিদ্রোহ। "সমাজ সংস্কার সব দূর হোক, ভেঙ্গে যাক,—বিশ্বমানবতাই জাতির একমাত্র লক্ষ্য। ঘন ঘন হাততালির পর সভাভঙ্গ হইল।

যুগ ধর্ম্ম

বিন্ধ্যবাসিনী অপমানের চূড়ান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিল। ঠাকুর ঘরে কালীমূর্ত্তির ফটো ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিল—আজ হইতে সে প্রগতিশীল হইবার চেষ্টা করিবে। নাচ শিখিবে, সিনেমা দেখিবে কংগ্রেসের সদস্য হইবে—ও বাড়ীতে বসিয়া যা তা লিখিবে।

বিংশ শতাব্দীতে অধ্যয়নের স্থান নাই—।

স্বষ্টিধরের বিবাহ

নক্সা

বন্ধুমহলে স্বষ্টিধরের 'আপ-টু' ডেট বলিয়া খুব খ্যাতি আছে। ইংরেজী বই ছাড়া সে সিনেমা দেখে না—মাথায় সাবান ঘসে, আট-চল্লিশ ইঞ্চি মিহি ধুতি পরে এবং যখন তখন চা খায়।

দোষের মধ্যে সে একটু থিয়েটার-পাগলা। পাড়ার পাঁচজন ছেলে একত্র হইলেই সে থিয়েটারের কথা ফাঁদিয়া বসে।

—কর না হে একটা প্লে-টে্ল। কতই বা খরচ?—"বৈকুণ্ঠের খাতা" করবে?

"বৈকুণ্ঠের খাতা"?—কার লেখা? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সকলে তাকাইয়া থাকে৷

বন্ধুদের এই অজ্ঞতায় স্বষ্টিধর গর্ব্ব অনুভব করে। বলে,—সাহিত্যের কিছুই খোঁজ রাখ না দেখছি। রবিবাবুর "বৈকুণ্ঠের খাতা" পড়নি? উইদাউট ফিমেল অমন হিউমরাস বই আর আছে? হাসতে হাসতে দম ফেটে যাবে।

বাঙালীর ছেলে থিয়েটারের কথা শুনিলে লাফাইয়া উঠে।

তাই পাড়ায় পাড়ায় রিহার্সাল লাগিয়াই আছে। সুদূর পল্লী-গ্রামেও দেখিয়াছি "কর্ণার্জ্জুন"—"বঙ্গেবর্গী"—"আলিবাবা"র বৎসরাবধি ধরিয়া রিহার্সাল চলিতেছে। অভিনয় হউক আর নাই হউক।

কাজেই তখনই ভূমিকা বণ্টন হইয়া গেল। বিকাল বেলা পাড়ার লাইব্রেরী হইতে বই জোগাড় করিতে হইবে এবং আজ সন্ধ্যা হইতে রিহার্সাল সুরু হইবে। স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল সৃষ্টিধরের বাড়ীতে।

এই ত গেল সৃষ্টিধরের পরিচয়-পত্র। এইবার আসল ঘটনার অবতারণা করা যাক। সৃষ্টিধরের তিন দিন বাদে বিবাহ। এ কয়দিন বন্ধুমহলে তার ভাবী পত্নীর 'কালচার' সম্বন্ধে খুব জোরালো আলোচনা চলিতেছে। সৃষ্টিধরও পত্নীর গুণ বর্ণনায় পঞ্চমুখ। বলে, দেখিস তখন তোদের সকলের সামনে বসে গান গাইবে। খুব 'আপ-টু-ডেট,' এমন ফ্রিলি সকলের সঙ্গে মিশতে পারে, শুনলে আশ্চর্য্য হতে হয়।

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করে, কদ্দুর অবধি পড়েছে ?

একটু অপ্রতিভ হয়ে সৃষ্টিধর বলে, ইউনিভার্সিটি এডুকেশন যদিও ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত কিন্তু ভদ্রসমাজে মিশতে হলে আগে শিখতে হবে 'এটিকেট'। আজকালকার দিনে বাঙালীর ঘরে 'স্মার্ট' মেয়ে কটা পাওয়া যায় ? সবই যেন মিনমিনে ননীর পুতুল ; আমার ওয়াইফ বক্সিং জানে।

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্ট্রি কোং"

বিস্ময়ে কাহারও মুখে কথা ফোটে না। সকলে আশায় দিন গোণে, কবে সেই তেজস্বিনী নারীর সঙ্গে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য হইবে।

সৃষ্টিধর বলে, ফুলশয্যার পরদিনই একটা 'টি পার্টিতে' ওয়াইফ তোদের 'এন্টারটেন' করবে। কি খাবি বল্? স্যাণ্ডউইচ' খেয়েছিস্?

উপস্থিত বন্ধুদের মধ্যে কেহই খায় নাই। কাজেই কেহই কোন কথা বলিল না। কেবল সাতকড়ির অতটা বেকুব বনিতে আঁতে ঘা লাগিল। বলিল, হ্যাঁ আমি খেয়েছি মামার বাড়ী। পাঁউরুটীর মধ্যে কাসুন্দি দিয়ে করে ত?

সৃষ্টিধর ত হাসিয়াই খুন। কাসুন্দি কি রে? ও ত 'মাষ্টার্ড'। তবেই তুমি খেয়েছ।

পরমুহূর্ত্তে সাতকড়িকে বেমালুম অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে জেরা করিল, কিসের কিসের 'স্যাণ্ডউইচ' হয় বল্ ত?

সাতকড়ি এবার সত্যই ফাঁপরে পড়িল। বস্তুত 'স্যাণ্ডউইচ' সে কোনদিন খায় নাই—নাম শুনিয়াছে মাত্র। উপায়ান্তর না দেখিয়া বেকুবের মত হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—বাঙালীর ছেলে সাহেবী খানার কোন প্রয়োজন হয় না।

সৃষ্টিধর বিজয় গর্ব্বে বলিল,—সে আমি আগেই বুঝেছি। কিন্তু একবার খেলে আর ভুলতে পারবি না। আমার 'ওয়াইফ', খুব ভাল 'স্যাণ্ডউইচ' করতে পারে। সে দিন 'টি পার্টিতে' খাওয়াব।

সৃষ্টিধরের বিবাহ

সাতকড়ি প্রশ্ন করে, বিয়ের আগেই ওয়াইফের এত 'কমপ্লিমেণ্ট' জোগাড় করলি কোত্থেকে? তুই ত চাক্ষুষ কোনও দিন দেখিস্ নি?

সৃষ্টিধর বলে, যাকে জীবনের অর্দ্ধাঙ্গিনী করতে যাচ্ছি, তার বিষয় ভাল করে না জেনেই কি বিয়েতে মত দিয়েছি? আমার টেষ্ট-এর সঙ্গে ওর টেষ্ট না মিললে বিয়ে কখনও হ্যাপী হতে পারে? আমার এক বুজুম ফ্রেণ্ডকে 'স্পাই' লাগিয়েছি, সে-ই সব খবর দেয়।

ইহার পর আর কোন কথা হইল না। সকলে সৃষ্টিধরের উর্ব্বর মস্তিষ্কের যথেষ্ট তারিফ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

যথারীতি বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

আজ ফুলশয্যা! সৃষ্টিধরের চরম পরীক্ষার দিন। এই কয়দিন বিদুষী পত্নীর সহিত কিভাবে কথা বলিবে ইহা লইয়া দিবা-রাত্রি মাথা ঘামাইয়াছে। প্রত্যেকটি কথা ওজন করিয়া বলিতে হইবে। একদিন যা একটু সমীহ। তার পর আর সঙ্কোচ কি? সেও কিছু কম 'আপ্-টু-ডেট্' নয়? পত্নীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে কেন? ইত্যাদি নানা এলোমেলো চিন্তা মাথার ভিতর জট পাকাইতে লাগিল।

অবশেষে অনেক আচার-অনুষ্ঠান সামাজিক বিধি-নিষেধের গণ্ডী পার হইয়া শয়নের সময় উপস্থিত হইল। এইবার বধূকে সে নির্জ্জনে পাইবে। বধূও এতক্ষণ ঘোমটা টানিয়া এবং কথা না

বলিযা বোধ হয হাঁপাইযা উঠিযাছে। সৃষ্টিধরের রাগ হইল। 'আপ-টু-ডেট' মেযেদের রেজেষ্টারী করিযা বিবাহ হওযাই উচিত।

গুটিকযেক সুবেশা তরুণী নানারূপ হাস্য-কৌতুকের সঙ্গে বধূকে ঘরে ঠেলিযা বাহিব হইতে শিকল আটকাইযা দিল। ভিতর হইতে দরজাটা আস্তে বন্ধ করিযা সৃষ্টিধর হাঁপ ছাড়িযা বাঁচিল। চেযারে বসিযা মিনিট দুই দম লইযা অবগুণ্ঠিতা বধূকে উদ্দেশ করিযা বলিল। ঘোমটাটা তুলে ফেল—আর কেউ আসবে না।

দরজা বন্ধ করে দিযেছি। সারাদিন যা কষ্ট গেছে তোমার। যাক্—একদিনই ত।

পাঁচ মিনিট উত্তীর্ণ হইযা গেল, কোন উত্তর আসিল না।

সৃষ্টিধর ভাবিল, বধূ বোধ হয তাহাকে এ বাড়ীর অন্যান্য সকলের মত অশিক্ষিত মনে করিতেছে। মনে মনে একটু মুচকি হাসিযা আরম্ভ করিল। "রোমিও জুলিয়েট" দেখেছ ত? তুমি আজ 'জুলিযেট' আমি 'রোমিও'। আমরা সারারাত জেগে কাটাব, কি বল?—অবশ্য আমাদের এই রাতই শেষ নয। বলিযা নিজেই একটু জোর করিযা হাসিল।

বধূ যেন আরও বেশী সঙ্কুচিত হইযা উঠিল।...ওকি ফোঁস ফোঁস শব্দ কিসের? বধূ কাঁদিতেছে নাকি? সৃষ্টিধরের মাথার ভিতর

সব ওলট-পালট হইয়া গেল। জুলিয়েট কাঁদিয়াছিল তার অর্থ আছে, সে কান্না আসন্ন-বিরহের। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিরহের নামগন্ধও যে নাই! নাঃ মহা মুস্কিলে পড়া গেল দেখছি! সৃষ্টিধরের গলা শুকাইয়া আসিয়াছিল! কুঁজা হইতে এক গ্লাস জল লইয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। 'বড় গরম' বলিয়া অহেতুক ফ্যানের রেগুলেটারটা শেষপ্রান্তে ঘুরাইয়া দিল। তারপর মরিয়া হইয়া আরম্ভ করিল। জিঞ্জার রোজার্সের ড্যান্স তোমার কেমন লাগে? ভারী সুন্দর, না?···গার্বোর ক্যামিলী মারভেলাস, কি বল? ··আমি মেট্রোতেই দেখেছি।

ফোঁস-ফোঁসানি যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সৃষ্টিধরের এইবার যথার্থ শঙ্কা উপস্থিত হইল।

তবে কি তাহার স্পাই বেচারী করিয়াছে?

সন্দেহটা মগজে স্থান পাইবামাত্র এক বিভ্রাট ঘটিল। নব বধূ ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে হঠাৎ সৃষ্টিধরের পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল, এবং পড়িয়াই ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিল—

···ওগো, আমি তোমার শ্রীচরণের দাসী। আমার সঙ্গে ঠাট্টা কর না।

ইহার পর কি হইল না বলাই ভাল। দুই দিন পর 'আনন্দবাজার নিরুদ্দেশ স্তম্ভে' নিম্নলিখিত লাইন কয়টি দেখিলাম,···

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্‌ট্রি কোং"

বাবা সৃষ্টিধর !

আজ দু'দিন হইল তোমার মা শয্যাশায়ী বাড়ীশুদ্ধ সকলেই আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে। আমার হাঁপানীও খুব বেশী বাড়িয়াছে। যেখানেই থাক, অবিলম্বে সংবাদ দিয়া তোমার মায়ের প্রাণ রক্ষা করিবে।

তোমাব বাবা।

অস্পৃশ্য

ঠাকুর দালানের সংলগ্ন পরিত্যক্ত টিনের ঘর। টিন স্থানে স্থানে ফুটা হইয়া ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে। জোড়া-তালি লাগাইলেও মনুষ্য-বাসের অযোগ্য, যেমন স্যাঁত সেঁতে তেমনি ঘুটঘুটে অন্ধকার।

কতকগুলি বাঁশ, কাঠের বাক্স, মাছধরা ছেঁড়া জাল, শিশি-বোতল আর ছেঁড়া চট্ ঘরটায় গুদামজাত হইয়া আছে।

তাহারই ফাঁকে ঠাঁই করিয়া বহুদিন হইল বাদুড়, আরশোলা আর ইঁদুর পরিবার সুখে দুঃখে দিন যাপন করিতেছিল।

সপ্তমী পূজার পূর্ব্বদিন,—বোধন। সন্ধ্যার সময় মহাসমারোহে ঠাকুরদালানের আসনে দুর্গাপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছিল। ঢাক, ঢোল, সানাইয়ের রবে চতুর্দ্দিক মুখরিত। সকলেই হাসি-মুখে বৎসরকারদিনে মাকে আবাহন করিয়া লইতেছে। সকলের প্রাণেই আনন্দের ঢেউ।

সেই কোলাহলের মধ্যে অন্ধকারে গা ঢাকিয়া একটি শীর্ণ কুকুর চারিটি শিশুসন্তান বুকে করিয়া সন্তর্পনে টিনের ঘরে প্রবেশ করিল।

আসিযাই শুইয়া হাঁপাইতে লাগিল। কুন্দ ফুলের মত শুভ্র চারিটি শিশু ; নিশ্চিন্ত আরামে জননীর স্তনে মুখ দিয়া চক্ষু মুদিয়া আছে। কাহারও ব্যথা বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের এখনও হয় নাই।

তিন দিন হইল শিশু চারিটি ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। এখনও চোখ ফুটে নাই। মা বুঝিযাছে বাসস্থান নিরাপদ নয়, তাই তাদের বুকে আঁকড়াইয়া দুর্ব্বল শরীরে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া এই আশ্রয়টুকু বাহির করিয়াছে। ক'দিন হইল তাহার আহারও জুটে নাই। জননীর প্রাণ সন্তানের জন্য সর্ব্বদাই শশঙ্ক। কোনমতেই নিশ্চেষ্ট হইযা বসিয়া থাকিতে পারে না।

বিজয়া দশমী।

সকাল বেলাটা সকলেই প্রাণ ভরিয়া আমোদ করিয়া লইতে-ছিল। আর কতক্ষণই বা—ঘণ্টা কয়েক মাত্র। তার পরই তো সমস্ত বৎসরের আশা আকাঙ্ক্ষা মাত্র তিনটি দিন মেয়াদের পর ধুইযা মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইযা যাইবে। শুধু তার ব্যথাভরা করুণ স্মৃতি কঠোর বাস্তবের ভিতর থাকিয়া থাকিয়া ভাসিয়া উঠিবে।

যতকক্ষণ দিনটাকে আনন্দের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা যায়।

অনাহারক্লিষ্ট দুর্ব্বল শরীর আর বহিতে চায় না। তবু উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। স্তনের দুগ্ধ শুকাইয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। নিজের জন্য বাঁচিয়া থাকা অর্থহীন। কেবল সন্তানের মুখ চাহিয়া —চারিটি একান্ত শিশু।

অস্পৃশ্য

দেবতার আশীর্ব্বাদ ?—না অভিশাপ ? আজ শিশু চারিটির চোখ ফুটিয়াছে। ঘরময় অস্ফুট স্তিমিত নেত্রে জননী তাহাদের এই চাঞ্চল্য নিরীক্ষণ করিতেছে। চোখ বাহিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। আনন্দের কি দুঃখের, কে বুঝিবে ! শিশুদের একটু আদর করিয়া, সযত্নে ছেঁড়া চট্‌টার উপর শোয়াইয়া দিয়া, আহার-অন্বেষণের জন্য মা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

দশমীর শেষ পূজা আরম্ভ হইয়াছে। পূজার নিকট আজ আর সে-রকম লোকের ভীড় নাই। অনভিপ্রেত বিদায়ের শেষ অনুষ্ঠান দেখিবার স্পৃহা কাহারও ছিল না। তথাপি নির্ব্বিঘ্নে যাহাতে অনুষ্ঠান শেষ হয় তাহার তদ্বির করিবার জন্য দু'চার জন গালিচা পাতিয়া দালানের বারান্দায় বসিয়াছিলেন।

নহবতের করুণ রাগিণীতে ঘনায়মান বিদায় বেলা আরও মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ হৈ-হৈ। [illegible] কর্ম্মরত পুরোহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিল।

একটা শীর্ণ কুকুর নৈবেদ্যের কলা মুখে লইয়া দৌড়াইতেছিল। সকলেরই দৃষ্টি তাহার দিকে পতিত হইল। অজ্ঞাত অমঙ্গল-আশঙ্কায় সকলেই শিহরিয়া উঠিল। এতদিনের প্রাণপাত অক্লান্ত পরিশ্রম, একটা কুকুর এক মুহূর্ত্তে সব পণ্ড করিয়া দিল।

পূজার তদারক করিবার ভার ছিল কৈলাস চক্রবর্ত্তীর উপর।

দোষ তাঁহারই ঘাড়ে পড়িবে। রাগে দুঃখে অন্ধ হইযা তিনি একখানা থান ইঁট লইয়া ছুটিযা চলিলেন।

দুর্ব্বল জীব বেশী দুর অগ্রসর হইতে পারে নাই। চক্কোর্ত্তির অব্যর্থ লক্ষ্যে করুণ আর্ত্তনাদ করিযা ধরাশাযী হইল। চোখের কোল চিরিযা ফিনকি দিযা রক্ত ছুটিতে লাগিল! ভ্রূক্ষেপ না করিযা চক্রবর্ত্তী তাহার উপর সজোরে এক ঘা লাঠি বসাইযা দিলেন। তাঁহার আক্রোশ যেন আর মিটিতে চাহিতেছিল না। আর একবাব কাহার উদ্দেশ্যে মর্ম্মভেদী শেষ ডাক ডাকিয়া অবলা জীবন স্থির নিস্পন্দ হইযা গেল।

ভীডেব মধ্যে কে একজন বলিযা উঠিল,—অলক্ষুণের ঠিক শাস্তি হযেছে।

অসহায মুমুর্ষু—মাতৃহারা শিশু চারিটির ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না। তাহাদের দুখ কেহ বুঝিল না; বুঝিবার উপাযও নাই।

বিসর্জ্জনেব সমযে সকলে বলাবলি করিল,—এবার মার মুখখানা বেশী ভাব বোধ হচ্ছে।

ব্যথিতের বেদনায যাহার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদিযা উঠে, তাহার এই স্পষ্ট অভিব্যক্তি মানুষের স্থূল দৃষ্টির গণ্ডী ভেদ করিতে সক্ষম হইল না।

কু-সংস্কারের মোহে এমনই আচ্ছন্ন যে।

"সুইসাইড্"

নমিতার চিঠি লইয়া যে এত বড় একটা ফ্যাসাদের সৃষ্টি হইবে তাহা হরিহর কল্পনাও করিতে পারে নাই। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা!

বাড়ীতে জানাজানি হইয়া গিয়াছে এবং ইহার জের যে শ্বশুর-বাড়ীতেও পৌঁছাইবে না তাহাই বা নিশ্চয় করিয়া কে বলিতে পারে? তারপর ইহা লইয়া কতদূর গড়াইবে তাহারই ভবিষ্যৎ কাল্পনিক রূপ চিন্তা করিতে করিতে হরিহর ক্রোধে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

ছোট বোন ছায়া চায়ের পেয়ালা লইয়া ঘরে ঢুকিতেই ধমক খাইয়া অর্দ্ধেক চা মাটিতে ফেলিয়া দিল। তীব্র ভর্ৎসনার সুরে হরিহর প্রশ্ন করিল, চিঠির কথা মা জানলো কি ক'রে? আমার চিঠিতে হাত দেয় কে?

ছায়া থতমত খাইয়া বলিল, ব'-রে—আমি কি জানি? শুধু শুধু আমায় বকছো কেন? বাবাঃ—একেবারে চম্‌কে উঠেছি। অত রাগ বাপু আমার কাছে দেখিয়ো না। বলিয়া 'ঠক্' করিয়া

পেযালাটা টেবিলের উপর রাখিযা আরও কি বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল।

হরিহরের ক্রোধের মাত্রা ইহাতে বিন্দুমাত্র উপশম হইল না। দরজাটা সজোরে বন্ধ করিয়া চেযারে গুম্ হইযা বসিযা রহিল।

ঘটনাটা এমন কিছুই নয়। স্বামী-স্ত্রীতে ও-রকম মান-অভিমানের পালা প্রাযই ঘটিযা থাকে আবার মিটিযাও যায। এ ক্ষেত্রেও তাহা হইত কিন্তু নমিতার চিঠির মাত্র একটি কথায যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইযাছে।

মাস দু'যেক হইল নমিতা পূজা উপলক্ষে বাপের বাড়ী গিযাছে। স্ত্রীর চিঠি হরিহর যথারীতি পাইযা থাকে। নব-বিবাহিতের প্রথম বিরহে যাহা হয—ঘন ঘন অভিমান। কে কাহাকে ছোট করিযা চিঠি লিখিযাছে—কাহার উত্তর দিতে একদিন বিলম্ব হইল ;—হইবারই কথা, আমার কথা বোধ হয আজকাল মনে হয় না, অন্য কাহাকেও ভালবাসিলেই হয—নমিতার তাহাতে কোন আপত্তি নাই ইত্যাদি যত রকম তুচ্ছ খুঁটিনাটি হইতে পারে। ইহাও একরূপ মন্দ চলিতেছিল না। হঠাৎ সেদিন নমিতা লিখিযা বসিল,—তাব বাঁচিযা থাকিযা লাভ কি ? কাহারও পথের কাঁটা হইযা সে বাধা দিতে চায না। যথাসম্ভব শীঘ্রই সে 'সুইসাইড্' করিবে তখন যেন আর একজন সুখী হয।

চিঠিটা পড়িযা হরিহরের মন্দ লাগিল না।

"সুইসাইড"

কারণ এ পর্য্যন্ত স্ত্রীর চিঠি বন্ধুদের একটিও দেখাইতে পারে নাই। সংসারের যত সব অবান্তর কথা দিয়া চিঠির পাতা ভর্ত্তি করা যেন নমিতার অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। মেয়েদের স্বভাবই এই—বিবাহ হইলেই যেন পাকা গিন্নী বনিয়া যাইতে চায়। দায়িত্বজ্ঞানের আর সীমা থাকে না। তাহার পৈত্রিক ঋণ যতই থাক না কেন তাহাতে নমিতার এত মাথা ব্যথা কেন? হরিহরের এখনও চাকুরী হইল না—ভবিষ্যতে কি হইবে, তার উপর ছেলেপুলে হইলে খরচ বাড়িবে বই কমিবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ সংসারের দুর্ভাবনায় তাহার যেন নিদ্রা হয় না।

আজ এই প্রথম নমিতা নিছক 'প্রেম-পত্র' লিখিয়াছে, যাহা কিনা বন্ধুমহলে তারিফ পাইবার যোগ্য। সুতরাং হরিহরের মনটা স্বভাবতঃই খুশীতে ভরিয়া উঠিল এবং ইহারই জের টানিয়া দ্বিতীয়বার চিঠিখানিতে চোখ বুলাইতেই তাহার মুখ হঠাৎ কালো হইয়া উঠিল।

চিঠির মধ্যে চারিবার সুইসাইডের উল্লেখ আছে, কিন্তু চারবারই বিশ্রী রকমের বানান ভুল। প্রথমে লিখিয়াছে, sύciet—দ্বিতীয়বার suisid—তৃতীয়বার cucide এবং সকলের শেষে shucite।

অতএব এখানিও মাঠে মারা পড়িল। বন্ধুদের এতদিন সে মিথ্যা 'স্তোক' দিয়া আসিয়াছে যে তার স্ত্রী ম্যাট্রিক পাশ। এ চিঠি তাহাদের হস্তগত হইলে আর রক্ষা আছে? হয় ত বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট্ দেখিতে চাহিবে। বহুদিনের অন্ধকারের পর আজ সে আলোকের সন্ধান পাইয়াছিল কিন্তু পোড়া অদৃষ্টে তাহাও সহিল না। ইহা কি কম দুঃখের কথা? কেন বাপু—ইংরাজী যখন জানোই না তখন বিদ্যা জাহির করিবার দরকারটা কি?

নিদারুণ ক্রোধে সে নমিতাকে লিখিয়া দিল,—

চিঠি পেলাম। না পেলেই আনন্দ হ'ত! "সুইসাইড্" কর্‌তে যেয়ো না, কারণ তার বানান জানো না। দেশী মতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা কোরো। তোমার মত অশিক্ষিত গেঁয়ো মেয়ের মরণই মঙ্গল।

লেখা শেষ করিয়া বার বার লাইন কয়টি পড়িয়া সে উৎকট আনন্দ লাভ করিল। ঠিক হইয়াছে। এবার জব্দ হইবে নমিতা! মেয়ে মানুষের এত অহঙ্কার ভাল নয়।

তার পরদিন। মধ্যাহ্নে হরিহর নিয়মিত তাসের আড্ডায় বাহির হইয়াছে। আহারাদির পর বিশ্বেশ্বরী দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছিলেন। রবিবার—ছায়ার স্কুলও বন্ধ। দুপুরে সে বড়দার ঘরটা একটু গুছাইয়া রাখিতেছিল। টেবিলের অগোছাল কাগজপত্র ঘাঁটিবার সময় নমিতার চিঠিটা একটা মোটা বই হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বৌদির চিঠি! খামের শিরোনামা দেখিয়াই ছায়া বুঝিল; এবং স্বাভাবিক ধর্ম্ম পালন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিল না।

"সুইসাইড"

বিশ্বেশ্বরী একটা হাত-পাখার সন্ধানে সেই দিকেই আসিতেছিলেন। চিঠি দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, কার চিঠি রে ?

ছায়া বলিল, বৌদির। দাদাকে লিখেছে—.

বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, দ্যাখ্ তো বোমা কি লিখেছে, বেয়ানের অসুখ শুনেছিলাম, ভাল আছেন তো ?

ছায়ার বয়স হইয়াছে, কিন্তু সে অনুপাতে বুদ্ধি এখনও পরিপক্ক হয়নি। বলিল,

আমি বাবা পারবো না। কি সব যা তা ভয়ের কথা লেখা আছে। এই দ্যাখো তুমি—

বলিয়া নির্বিবাদে চিঠিখানি মায়ের হাতে তুলিয়া দিল।

বিশ্বেশ্বরী ইংরাজী জানিতেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, ইংরেজী কথাটার মানে কিরে ?

ছায়া প্রথমে বলিতে চাহিল না। অবশেষে বিশ্বেশ্বরীর পীড়াপীড়িতে বলিয়া ফেলিল, ওটাই তো ভয়ের। 'সুইসাইড্' মানে আত্মহত্যা। বৌদি শীগ্‌গীরই আত্মহত্যা করবে লিখেছে।

আত্মহত্যার কথা শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। আজকাল বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের নিকট ইহা যে কত সুলভ সংবাদপত্র পাঠে তাহা তাঁর অবিদিত ছিল না। তা ছাড়া নমিতাকে সত্যিই তিনি স্নেহ করিতেন। ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। এসব কি অলক্ষুণে কাণ্ড! ছায়াকে বলিলেন, উনি কোথায় ? একবার ডেকে দেতো—

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্‌ট্রি কোং"

'উনি' হরিহরের বাবা। রবিবারের ভুরিভোজনের পর সবেমাত্র তাঁর নাসিকা গর্জ্জন সুরু হইয়াছিল, ছায়া আসিয়া ঠেলিয়া জাগাইয়া দিল। বলিল, মা ডাকছে ওপরে—

কাঁচা ঘুমের ঘোর তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই, এই অবস্থায় 'সুইসাইডে'র নোটিশযুক্ত চিঠিটা কার্ত্তিকবাবুকেও কম বিচলিত করিল না। দেশের আব্‌হাওয়া হইল কি? মাত্র এক বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে ইহার মধ্যেই এরূপ মনোমালিন্য যে 'সুইসাইড্‌' করিতে হইবে? কই, তাঁদের সময়ে তো এ সবের বালাই ছিল না। কথায় কথায় 'সুইসাইড্‌' আজকাল যেন ফ্যাসানে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই তো কিছুদিন পূর্ব্বেও কাগজে দেখিয়াছেন একটি কলেজের ছাত্র শ্যামবাজার হইতে পয়সা খরচ করিয়া 'বাসে' চড়িয়া আসিয়া "লেকে "সুইসাইড্‌" করিয়া গেল। ছেলেটির পকেটে এক টুক্‌রা কাগজে লেখা ছিল, পৃথিবীটা ভদ্রলোকের বাসোপযুক্ত নয়; সেই জন্য অন্যত্র চলিলাম।

পত্নীর সঙ্গে বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছুক্ষণ পরামর্শ করিয়া কার্ত্তিকবাবু স্থির করিলেন, সন্ধ্যার সময়ে হরিহর বাড়ী ফিরিলে সমস্ত ব্যাপার খোলাখুলিভাবে তাহার নিকট হইতে জানিয়া বিধিমত ব্যবস্থা করিলেই চলিবে। অনর্থক সোরগোল করিয়া লাভ কি?

তাহাই হইল। সন্ধ্যার কিছু পরে হরিহর বাড়ী ফিরিতেই ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞা নিবেদন করিয়া গেল। এখনই তাহাকে যাইতে হইবে।

“সুইসাইড”

পাড়ার গুটিকয়েক প্রৌঢ় ব্যক্তির সঙ্গে কার্ত্তিকবাবু যথারীতি দাবার বৈঠক জমাইয়া তুলিয়াছিলেন। হরিহর ঘরে প্রবেশ করিয়া ফরাসের এক কোণে বসিয়া পড়িল। বাবার সম্মুখে বরাবরই সে কাবু। কোন কথা গুছাইয়া বলিতে পারে না।

কার্ত্তিকবাবু একালের নন। পুত্রবধূর চিঠির বিষয় লইয়া পুত্রের সম্মুখে আলোচনা করাটা যে ন্যায়সঙ্গত হইবে না সে খেয়াল তাঁর ছিল। শুধু তাই নয়; নিজের সঙ্কোচও ত কম নয়। তাই বুদ্ধি করিয়া পরিচিত পাঁচজনের সামনেই হরিহরকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, তাহারাই তাহাকে বুঝাইয়া একটা আপোষ মীমাংসা করিয়া দিতে সক্ষম হইবে।

পোষ্টমাষ্টার নীলরতনবাবু মুখপাত্র হিসাবে সুরু করিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, কি বাবাজি! বৌমার সঙ্গে কি সব ঝগড়াঝাটি করেছো শুন্‌ছি। মেয়েমানুষ তিনি, একটু বুঝেসুঝে চল্‌তে হয়। মেয়েছেলেরা কি রকম ‘সেন্টিমেণ্টাল’ জানো তো?

হরিহর মুখ লাল করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ইহার কি উত্তর দিবে সে? দিবার আছেই বা কি? একবার ইচ্ছা হইল মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলে—এতটা বয়স হইয়াছে আপনাদের, অভিজ্ঞতাও কম নয়; বৈষ্ণব-সাহিত্য কি কেহই পড়েন নি? রাধাকৃষ্ণের মান অভিমানের লীলা কি কাহাকেও চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে হইবে? কৃষ্ণের অদর্শনে রাধাও তো—“মরিব

মরিব সখি নিশ্চয় মরিব" বলিয়া আত্মহত্যা করিতে চাহিয়াছিল। এতো সকলেই জানে।

মনে মনে তোলপাড় করাই সার হইল। একটা কথাও মুখ দিয়া বাহির হইল না। আধ ঘণ্টা বৃদ্ধদের নানারূপ নীতি-উপদেশের সারগর্ভ বক্তৃতা নীরবে হজম করিয়া যখন সে বাহির হইয়া আসিল —নিষ্ফল আক্রোশে ভিতরটা জ্বলিয়া যাইতেছিল।

সাতদিন পরের ঘটনা। বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে। বিভূতিবাবু চায়ের পেয়ালা লইয়া খবরের কাগজে চোখ বুলাইতেছিলেন। তখনও তিনি পুরাপুরি শয্যাত্যাগ করেন নাই। ভৃত্য ঝাঁট দিবার সময় একটুকরো কাগজ মেঝে হইতে কুড়াইয়া তাঁহার হাতে দিল। বলিল, দেখুন তো বাবু, দরকারী চিঠি কি না—

চিঠিটা ভাঁজ করা ছিল। বিভূতিবাবু খুলিয়া পড়িলেন, পড়িবামাত্র তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। ভৃত্যের সম্মুখে সে ভাব দমন করিয়া বলিলেন—তোর মাকে একবার পাঠিয়ে দে—

ভৃত্য চলিয়া গেলে মনোযোগের সহিত চিঠিখানা পড়িতেই সন্দেহ আরও স্পষ্টতর হইল।

এই তো জামাইয়ের হাতের লেখা! নমিতাকেই লিখিয়াছে। উপরের তারিখ দেখিলেন, পাঁচদিন পূর্ব্বের লেখা। তাই তো কয়দিন হইতে নমিতা মুখ ভার করিয়া থাকে।

কিন্তু এমন কি ঘটিয়াছে যার জন্য হরিহর এমন গুরুতরভাবে

চিঠি লিখিয়াছে। তাঁহার মেয়ের স্বভাব তিনি ভাল করিয়াই জানেন, সে কোন অপরাধ করিতে পারে—বিশ্বাস করাই কঠিন। হরিহরও তো খারাপ ছেলে নয়। তবে…

নানারূপ দুর্ভাবনা তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। অস্থির চিত্তে অপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি নিজেই সুরবালার ঘরে উপস্থিত হইলেন।

সুরবালা কার্পেটে ফুল তুলিতেছিল। ঈষৎ হাসিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, কি ব্যাপার? এত সকালেই যে তাগাদা?

বিভূতিবাবু খাটের উপর বসিয়া পড়িলেন।

—ব্যাপার সুবিধের নয়। এই ছাখ, তোমার জামাইয়ের চিঠি।

চিঠি পড়িয়া সুরবালা স্তম্ভিত হইয়া গেল।

—তুমি কোথায় পেলে এ চিঠি?

বিভূতিবাবু: আমার ঘরের মেঝেয় পড়ে ছিল। ছেলে-মেয়েদের কীর্তি হবে!

সুরবালা: নমিতা তো আমাকে কিছুই বলে নি এ সব কথা। যে চাপা মেয়ে ও—

বিভূতিবাবু: একটা পরামর্শ দাও, কি করা যেতে পারে? মেয়েছেলের মন একটু আঘাতেই ভেঙে পড়ে। আর যা দিন কাল পড়েছে, কাগজে তো প্রায়ই 'সুইসাইডে'র কথা দেখি। সেই তো ভয়—

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্‌ট্রি কোং"

স্বামীর কথায় সুরবালার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের কথাও নয়। নমিতা অশিক্ষিতা গেঁয়ো—তার মরণই মঙ্গল, এ সব তো আর জামাই শুধু শুধু লেখে নি? রীতিমত দুঃখ লইয়াই লিখিয়াছে। কিন্তু দুঃখটা যে কি, স্বামী স্ত্রী আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও হদিশ পাইলেন না।

বিভূতিবাবু বলিলেন,—তুমি আড়ালে নমিতাকে খোলাখুলি সব কথা জিজ্ঞেস ক'রে আমাকে জানিও। আমি ত এসব বিষয় মেয়ের সঙ্গে আলোচনা কর্‌তে পারি না!

সুরবালা স্বীকৃত হইল। দুপুরে নমিতাকে সে সব কথা জিজ্ঞাসা করিবে।

বিকালে সুরবালা আসিয়া জানাইল—নমিতা কিছুই বলে না। জিজ্ঞাসা করিলেই কাঁদিতে থাকে।

বিভূতিবাবু রীতিমত চিন্তান্বিত হইলেন। সুরবালাও অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। তারই বা দোষ কি! তিনি পুরুষ মানুষ, তাঁহারই মাথা ঘুরিয়া যাইবার যোগাড়। ভালরকম ফ্যাসাদেরই সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক দিক্ দিয়া ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন—জামাইকে এখানে আসিবার জন্য 'টেলিগ্রাম' করিয়া দেওয়া হোক। সে আসিলে বিষয়টা পরিষ্কার হইতে পারে। কিন্তু 'টেলিগ্রাম' ত আর বিনা কারণে করা যায় না; করিলেই যে জামাই আসিবে তার নিশ্চয়তা কি? সুরবালা মত করিল—নমিতার পীড়ার সংবাদ দেওয়া হোক। বেয়ানরা একটু চিন্তিত হইবেন

এই যা! তা' হোক; নিজেদের অবস্থার গুরুত্ব হিসাবে সে আর কতটুকু? নমিতাও কাঁদিয়া কাটিয়া ভয়ানক মুষ্‌ড়াইয়া পড়িয়াছে।

বিভূতিবাবু তখনই নিজে টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়া টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন,

Nomita seriously ill, come immediately.

টেলিগ্রাম পাইযা হরিহরের মুখ শুকাইয়া গেল। বার বার নিজের ওপর সে ধিক্কার দিতে লাগিল। নিশ্চয়ই তাহার চিঠির এই পরিণাম দাঁড়াইযাছে। নীলরতনবাবু ঠিকই বলিয়াছেন—মেয়েমানুষের মন কত নরম! নমিতা এখন বাঁচিবে কি না, ভগবান জানেন। তাই বলিযা নমিতা সত্য সত্যই মরিযা যাইবে না কি?—উঃ কি ভযঙ্কর! হরিহর আর ভাবিতে পারে না। সেই যে এই অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী, তাহা অস্বীকার করিবে কি রূপে? রাগের ঝোঁকে গলায দড়ি দিতে লিখিয়াছিল বটে, কিন্তু একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন—নমিতাকে সে কত ভালবাসে। ভগবান করুন, নমিতা নিরাময় হইয়া উঠুক। এখন হইতে হরিহর তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিবে। বন্ধুবান্ধব ছারখারে যাক্! তাহারা কয় দিনের?

টেলিগ্রামের কথা শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। 'আত্মহত্যা'র চিঠির কথা মনে করিয়া আতঙ্ক আরও বর্দ্ধিত হইল।

নারায়ণ এখন ভালয় ভালয় রক্ষা করিলে হয়। তিনি গৃহদেবতার নিকট নমিতার আশু আরোগ্য কামনা করিয়া পাঁচসিকার বাতাসা মানৎ করিলেন।

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, আর দেরী নয়। আজ রাত্রের ট্রেণেই চলে যাও। গিয়েই টেলিগ্রাম করো কি অসুখ। আমরা খুব ব্যস্ত রইলাম।

'সুইসাইডে'র ভয়টা তাঁহারও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

সারারাত্রি ট্রেণে দুর্ভাবনায় বিনিদ্র কাটাইয়া ভোর সাড়ে পাঁচটার সময়ে হরিহর কলিকাতায় পৌঁছিল। ষ্টেশন হইতে শ্বশুরবাড়ী খুব বেশীদূর নয় ট্রামে কিংবা বাসেই যাওয়া চলে। কিন্তু হরিহর ট্যাক্সী করিল। নমিতা বাঁচিয়া থাকিলে, অনেক পয়সা সে রোজগার করিতে পারিবে। ট্যাক্সী আসিয়া শ্বশুরবাড়ীর দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। ভিতরে কোনই সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না কেন। অসুখের বাড়ী—দু' একজন জাগিয়া থাকিবার কথাই তো। খুব ইহাদের দায়িত্বজ্ঞান। সব বোধ হয় অসাড়ে ঘুমাইতেছে। নমিতার যদি কিছু প্রয়োজন হয়—কিংবা অসুখ হঠাৎ বাড়িতেও তো পারে? ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সে অতি সন্তর্পণে দরজার কড়া ধরিয়া নাড়িল। কি জানি সারারাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়া ভোরের ঠাণ্ডায় নমিতার হয় ত একটু চোখ ধরিয়াছে। শব্দ হইলেই জাগিয়া উঠিবে।

দরজা খুলিয়া গেল। কিন্তু এ কি! হরিহর ভূত দেখার মত

আঁতকাইয়া উঠিল। তাহার তিনহাত দূরেই যে নমিতা দাঁড়াইয়া। রোগশয্যা হইতে উঠিয়া আসিল না কি? কই—চেহারায় ত অসুখের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না! কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই নমিতাও মাথায় কাপড় টানিয়া সরিয়া গেল। বিস্ময় তাহারও কম হয় নাই।

হরিহরের বুকের উপর হইতে একটা ভারী বোঝা নামিয়া গেল। যাক্, নমিতা ভাল আছে তবে!

ইতিমধ্যে বাড়ীর সকলেই জাগিয়া উঠিয়াছে। বিভূতিবাবুর ট্যাক্সির শব্দেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। হরিহরকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। নমিতাকে স্বচক্ষে সুস্থ শরীরে দেখিয়া অসুখের প্রসঙ্গ শ্বশুরের সম্মুখে উত্থাপন করিতে হরিহরের লজ্জা করিতে লাগিল। তা' ছাড়া শালাশালীরা মহানন্দে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহার মধ্যে শুষ্ক মুখে 'কি অসুখ' প্রশ্ন করিলে নিজেই হাস্যাস্পদ হইবে। পৌঁছিয়াই বাবাকে টেলিগ্রাম করার কথা আছে। কিন্তু যেরূপ অবস্থা, তাহাই বা হয় কি করিয়া? বিন্দুমাত্র চিন্তার ছায়া কাহারও মুখে দেখা যাইতেছে না। শেষকালে ইহারা অসময়ে 'এপ্রিল ফুল' করিল না কি?

সঙ্কট হইতে বিভূতিবাবুই উদ্ধার করিলেন। হাসিয়া বলিলেন, Don't be nervous! নমিতা ভালই আছে। অসুখ বিশেষ কিছু নয়। চা'টা খাও—বিশ্রাম করো। বিকেলে সব কথা বলবো। ট্রেণ যার্নিতে কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই!"

হরিহর বলিল, "না না কষ্ট আর কি! সারারাত ঘুমিয়েই এসেছি।"

এক দুর্ভাবনা মন হইতে কাটিয়া গেল বটে—কিন্তু বিভূতিবাবুর রহস্যপূর্ণ কথার হাবভাবে নতুন চিন্তার সূত্রপাত হইল। বিকালে সব কথা বলিবেন। কি সব কথা? তবে কি বাবা নমিতার সুইসাইডের কথা এখানেও ঢাক পিটাইয়াছেন না কি? অসম্ভব কিছুই নয় কাণ্ডজ্ঞানের বলিহারি সব!

সারাটা দিন হরিহরের অস্বস্তিতে কাটিল।

বিকালবেলা বিভূতিবাবু তাহাকে দোতালায় এক নির্জ্জন ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। শাশুড়ীও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বিভূতিবাবু তাঁহাকে চেয়ারে বসিতে বলিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর যে ভাবে ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন, তাহা যেমন করুণ, তেমনি উপভোগ্য। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। শ্বশ্রু মাতাও অদৃষ্টের দোহাই পাড়িয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিলেন। দুরন্ত হাসির বেগে হরিহরের দম ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। নমিতা কাঁদিয়াছে তবে! মজা মন্দ হয় নাই।

হাসির বেগ সংবৃত করিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর অমূলক সন্দেহ প্রতিনিবৃত্ত করিতে হরিহরের যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইল। উপরন্তু নির্লজ্জের মত কহিয়া বসিল, নমিতাকে পাইয়া তাহার জীবন ধন্য হইয়াছে। বাস্তবিকই এই জন্য সে গর্ব্ববোধ করে।

ইহার উপর আর কথা চলে না। গণ্ডগোল মিটিয়া গেল।

এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন—শ্বশুরালয়ে হরিহর মুখের বাঁধন বিশেষ মানিয়া চলে না। আধুনিক কালের ইহাই বোধ হয় রীতি!

রাত্রে শয়নের সময়ে ঘরে যাইয়া হরিহর দেখিল,—নমিতা মুখ ঘুরাইয়া অন্য দিকে বসিয়া আছে। একটু মুচকি হাসিয়া সন্তর্পণে পিছন হইতে চোখ টিপিয়া ধরিতেই নমিতা অভিমানভরে বলিয়া উঠিল: "যাও, আমার কাছে কেন? আমি ত গলায় দড়ি দিয়ে মরে' গিয়েছি।"

হরিহর তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভাগ্যিস্ গলায় দড়ি দিতে শিখেছিলাম—না হ'লে এমন মধু-যামিনীটি…"

স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া নমিতা বোধ হয় ভাবিতেছিল—"সুইসাইড্" কথাটা যথার্থই খুব পয়া।

কালাচাঁদের প্লট বিভ্রাট

তিন দিন হল কালাচাঁদ চোখের পাতা ফেলতে পারে নি। "ইনসমনিয়া" নয়, চোখও ওঠেনি—শারীরিক কোন কষ্ট নেই। মানসিকের মধ্যেও এমন কিছুই নয় যার জন্যে শীতকালের এত বড় রাতটায় ঠায় হাঁটুর ওপর মাথা গুঁজে বসে থাকা যায়। "এগ্‌জামিনের" চিন্তা হয়ত আর এ জীবনে আসবে না—সে সব দুশ্চিন্তা পাঁচ বছর আগেই খতম হয়েছে। পেটের চিন্তা—পেটের অসুখ ছাড়া হবার কোন আশঙ্কা নেই—বাপের জমীদারী আছে। কিংবা উঠতি বয়সও নয় যে, পাশের বাড়ীর কোন সদ্য আলাপ হওয়া প্রেয়সীর চিন্তায় তিন দিন কেন, সারা জীবনটাই বিনিদ্র কাটাবার বাসনা মনে জাগ্রত হতে পারে। স্ত্রী কাদম্বিনীর এই ছাব্বিশ পেরিয়ে সাতাশ হতে চল্লো। মা ষষ্ঠীর কৃপায় ঘরে ছোট ছোট চারটে বিছানা পাততে হয়।

আসল কথা—কালাচাঁদ একজন উদিয়মান সাহিত্যিক—অন্ততঃ বন্ধুরা তাই বলে। তাদের অনবরত প্রশংসায় এবং পীড়াপীড়িতে কিছুদিন হল সে পাঁচ সাতটা গল্পও লিখে ফেলেছে। যেগুলি নাকি বঙ্গ সাহিত্যে দান বিশেষ—কারো মতে।

তোষামোদ জিনিষটা অবহেলার বস্তু নয়। বৈঠকখানায় কড়াই শুঁটির কচুরি আর চা খেতে খেতে বন্ধুদের তোষামোদে—কালাচাঁদের মস্তিষ্কে সাহিত্যের স্ক্রুটা হঠাৎ আলগা হয়ে গেল।

বন্ধুরা কালাচাঁদের সাহিত্য প্রতিভার তারিফ করে। কালাচাঁদও বন্ধুদের তারিফ এবং নিজের সাহিত্য চর্চ্চা, দুটোই বজায় রাখতে বাড়ীতেই একটা সাহিত্য সমিতি খুলেছে। মাসে একটা করে সভা হয়, তাতে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা গান ইত্যাদি সাহিত্য সম্বন্ধীয় কিছুই বাদ পড়ে না। শেষে চা আর জলখাবারের "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হয়। কালাচাঁদ ইতিমধ্যে সাত আটটি অধিবেশনে তার গল্পগুলি নিঃশেষ করেছে—সবই ঘরোয়া ব্যাপার। অর্থাৎ গল্পের চরিত্র সে, কাদম্বিনী, পুত্রগণ, বাসী ঝি আর উড়ে ঠাকুর গদাধর। বন্ধুদের বলে, কল্পনার গন্ধ পাবি না আমার লেখায়—এ একেবারে "রিয়ালিষ্টিক আর্ট", জীবন্ত, হাতছানি দিয়ে ডাকলেই ছুটে আসবে। বন্ধুরা স্বীকার করে। এখন বিনিদ্র রজনী যাপনের তত্বটা একটু তল্লাস করা যাক।

আসছে শনিবার মাসিক অধিবেশন। এটা নলডাঙ্গার কুমার বাহাদুরের সম্মানের জন্য আহ্বান করা হয়েছে। তাঁকে সভাপতি করে কিছু থোক রৌপ্যমুদ্রা কিংবা কাগজের ছাপ মারা চিট আদায় করতে পারলে—সম্মিলনীর একটা ছোটখাট লাইব্রেরী খাড়া করা যায়। সেই জন্যে সভাটাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার পরিকল্পনা কালাচাঁদের মন প্রাণ জুড়ে আছে বোল্লেও অত্যুক্তি করা

হয় না। কারণ সমিতির কর্ম্ম-সচিব হিসেবে দায়ীত্ব তারই বেশী। কিন্তু আজকের নিদ্রাহীনতা সে জন্যে নয়।

আসল দুর্ভাবনা—কালাচাঁদের নিজের লেখা আর 'ষ্টক'এ নেই! আগের মিটীংএ পঠিত "অভিমানিনী গৃহিণী" গল্পটাই তার শেষ গল্প। অথচ এত বড় একটা সভায় কর্ম্মসচিব হয়ে যদি কিছু না পড়ে তবে বড় বিশ্রী ও অশোভন দেখায়। আর কুমারই বা ভাববেন কি! তাঁর বাড়ীতে সে যে দু দিন দু ঘণ্টা ধরে সাহিত্য সম্বন্ধে এত সারগর্ভ বক্তৃতা দিল তারই বা মর্য্যাদা থাকে কি করে? এই দুর্ভাবনাই চোখের মধ্যে ছানি পড়ার মত জড় হয়ে পাতা দুটোকে বুজতে দিচ্ছে না। ভাষার ওপর তার দখল আছে, কালাচাঁদ তা ভাল করেই জানে, কিন্তু 'প্লট' কোথায়? "অভিমানিনী গৃহিণী" যে কাদম্বিনীকেই ইঙ্গিত করে লেখা তা কাদম্বিনী কোন ক্রমে টের পেয়েছে এবং জের স্বরূপ একদিন স্ত্রীর মুখ-নিঃসৃত কতকগুলো মিষ্টি মিষ্টি কথাও কালাচাঁদকে শুনতে হয়েছে। সুতরাং কাদম্বিনীকে চরিত্র রূপে দাঁড় করবার বাসনা থাকলেও সাহসে কুলুচ্ছে না। উড়ে বামুন আর বাসন মাজা ঝি কতই প্লট জোগাবে? আর প্রত্যেক গল্পে ছেলেদেরই বা কি কাঁহাতক ঢোকানো যায়? কালাচাঁদ কি যে করবে কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছে না। আজ বৃহস্পতিবার, মানে—বৃহস্পতিবার—রাত একটা। মধ্যে কেবল কালকের দিনটা। পরশু বিকেলে সভা। সেদিন সকাল থেকে মরবারও সময় দুষ্কর। কালকের

মধ্যে যে কোন উপায়ে—কালাচাঁদের মনে পড়লো তাদের গাঁয়ের যাত্রার রাবণের পার্ট। ছলে বলে কৌশলে একটা প্লট খাড়া করতেই হবে। জীবন যায় সে ভি আচ্ছা, প্লট চাই। তারপর আর সে কেয়ার করে না। এমন ভাষা ও ভাবের কারিকুরি দেখিয়ে দেবে যে শুনে কুমার বাহাদুর বুঝবে তখন, সাহিত্যের তেজ কাকে বলে!

বারান্দার দেয়ালে ঘড়িটায় ঢং ঢং করে তিনটে বেজে গেল। একটা উপায় আছে এই আশায় কালাচাঁদের মনের দুর্ভাবনা অনেকখানি কেটে গেল। কাল সকাল নটায় সে বাড়ী থেকে বের হবে, ফিরবে রাত নটায়। এই বার ঘণ্টা সময় সমস্ত কাশী সহরটা ঘুরলে একটা কেন, চাই কি দশটা প্লটও মিলে যেতে পারে। সত্যিই সে বোকা! এত বড় ফন্দিটা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তার মনে স্থান পায় নি। উঃ—দুই রাত্রি জেগে চোখের কোলে দু'ইঞ্চি কালি পড়ে গেছে। কালাচাঁদের চোখের পাতা দুটো দুর্ভাবনার ঠেকায় দু' রাত উঁচু হয়েছিল—আজ হঠাৎ ঠেকা একটু সরাতেই ধপ্ করে পড়ে গেল। রাত সাড়ে তিনটেয় কালাচাঁদ ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে রাত্রির কথা স্মরণ হতেই প্রাণে একটা প্রেরণার সঞ্চার হলো। তাড়াহুড়ো করে একখানা টোষ্ট চা দিয়ে চিবিয়ে নটা সতের মিনিটের পূর্ব্বেই সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। কাদম্বিনীকে বল্লে—নেমন্তন্ন আছে। রাস্তায় মিনিট পাঁচেক

দাঁড়াতে হলো গন্তব্য স্থান নির্দ্দেশ করতে। সাহিত্যের ইতিহাসে একেবারে অভিনব। কালাচাঁদ স্থির করলো প্রথমে বাজারে যাবে। সেখানে গল্পের অনেক চরিত্র হয়ত বাজার করতে আসবে। খুঁজে বার করতে পারলেই কাজ ফতে। রাস্তায় একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা। প্রশ্ন করলো, কি রে আজ যে হঠাৎ বাজারে! ঠাকুরের অসুখ না কি?

"না—এমনি এক জনের সঙ্গে দেখা করতে।" কথা কয়টা বলে কালাচাঁদ পাশ কাটালো। দু'ঘণ্টা সমস্ত বাজারটা কুড়িবার প্রদক্ষিণ করেও তার চোখে বিচিত্র কিছুই ঠেকলো না।

"এই ভাণ্টো ক্যা ভাও?"

"চার পয়সা মহারাজ।"

"দুর বেটা! দু' পয়সায় দিবি?

"নাহি বাবুজি! এইসান বড়িয়া ভাণ্টা—ইয়া দেখিযে—"

বেগুন ওয়ালা একটা বেগুন তুলে ধরল। "দেখেছি বাপু রাখ—বাজারে অনেক আছে। দু'পয়সা সের দেগা কি না বলো।" ভদ্রলোক চলে যাচ্ছিলেন।

"আইযে বাবু বউনিকা বখৎ—"

বেগুনওয়ালা দু'সের বেগুন ওজন করে দিল—ভদ্রলোক থলিতে পুরে চলে গেলেন। এই ত সাধারণ মামুলি ব্যাপার। নূতনত্ব কোথায় যে এই দিয়ে একটা গল্প খাড়া করা যায়? কালাচাঁদ মাছের বাজারে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ একটা

কালাচাঁদের প্লট বিভ্রাট

মাঝারি রুই মাছের দাম জিজ্ঞাসা করে বসলো : কত হবে মাছটা, তোলতো—

মাছওযালী ওজন করে বল্‌লো—এক সের—আট আনা।

-হেঃ—আট আনা! নয়া আদমি পাযা? বলে সে পা চালাচ্ছিল। মাছওযালী হাঁক ছাড়লো, শুনিযে বাবু আপ কেতনা দেগা?

কালাচাঁদ মহা ফাঁপড়ে পড়লো। কেনবার মোটেই ইচ্ছে নেই। দরটা অসম্ভব কমিযে বল্লো—চার আনা সের। মাছওযালী তাতেই রাজী। এখন উপায? পকেটে ত চারটে পযসা সম্বল। অজুহাত দেখিযে তাড়াতাড়ি বল্লো—মছলী আচ্ছা নেহি হ্যায়।

মছলী আচ্ছাই ছিল সুতরাং ও ভিত্তিহীন অজুহাত টিকলো না। কালাচাঁদকে দু'চারটে কড়া কড়া কথা হজম করতে হলো, উপরন্তু বেশ একটু ভীড়ও জমে গেল চারিদিকে। উপাযান্তর না দেখে সে তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করে বাজার থেকে বেরিয়ে পড়লো। কি আফশোষ! লোকে বলে দশাশ্বমেধের বাজার। দূর ছাই—এত বড় বাজারে একটা প্লট নেই। এগারোটা বেজে গ্যাছে। কালাচাঁদ কেমন একটু দমে গেল। অথচ ছুটিতে এখনও অনেক সময়। একবার ষ্টেশনে যেতে পারলে মন্দ হয় না। ওটাও একটা ভীড়ের জাযগা। হয়ত অনেক প্লট এর পরিষ্কার 'ওয়েটিং রুমে' ওর জন্তেই ওযেট করছে! সেই ভালো—ষ্টেশনেই যাওয়া

যাক্। কিন্তু পকেটে মাত্র চারটে পয়সা সম্বল। হণ্টন ছাড়া গতি নেই। গোধুলিয়া পার হয়ে কালাচাঁদ সোজা হাঁটতে লাগলো। ষ্টেশনে যখন এসে পৌছলো—ঠিক বেলা ১২॥০টা। লোকজন খুব কম। ট্রেণের সময়ও এখন নয় যে ভীড় হবার সম্ভাবনা আছে। দু'একটা কুলি এধার ওধার ঘোরা-ঘুরি করছে—তা ছাড়া আর কেউ নেই বোল্লেও হয়। দু'এক জন যারা আছে, বেঞ্চে হেলান দিয়ে ঢুলছে। কালাচাঁদের ইচ্ছে হচ্ছিল একটা কুলিকে ডেকে চারটে পয়সা দিয়ে বলে, বাপু তোমার জীবনের কাহিনীটি বলে যাও আমি লিখে নেই। ঠিকানা বলে দিচ্ছি—কিংবা আমার সঙ্গে বাড়ীতে এসো বেশ খুসী করে দেবো। কিন্তু পরক্ষণে মনে হল—কুলিরাই শেষে পাগল ঠাউরে রেলওয়ে পুলিশের কাছে তাকে উৎসর্গ করে দেবে। কাজ নেই অমন 'প্লট'এ! তার থেকে অপেক্ষা করাই শ্রেয়। 'বেনারস এক্সপ্রেস' এর জন্যে অনেক বাঙ্গালী ষ্টেশনে আসে। তাদেরই দরকার তার, তার গল্পের চরিত্র সব মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙ্গালী।

চানাচুরওয়ালা হাঁক ছেড়ে যাচ্ছিল। কালাচাঁদ দু'পয়সার চিনে বাদাম কিনে রুমালে বেঁধে নিল। খিদেও পেয়েছে অসম্ভব রকম। দুপুরের আজ এই আহার। কাদম্বিনী হয়ত নেমতন্ন শুনে আফশোষ করছে। তা হোক, এ কিছুই না। সে এই মুহূর্ত্তে যদি একটা 'প্লট' পায় তবে সাত দিন জলস্পর্শ না করে থাকতে পারে। সে 'পিকেটিং' করে আড়াই মাস জেল খেটেছে,

তার মধ্যে রাগ করে পনেরো দিন অনশনে ছিল। ভাবতে ভাবতে কালাচাঁদ বেঞ্চিতে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। একে দু দিন দু রাত্রি জাগরণ তার ওপর আজ এত বেলা অবধি পেটে ভাত পড়ে নি—শরীর দুর্ব্বলই ছিল, শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়লো। হঠাৎ মাথায় কার হাত লাগতেই কালাচাঁদ ধড়মড় করে উঠে বসলো। ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য। এক মাড়োয়ারী পোটলা হাতে কটমটিয়ে তার দিকে তাকাচ্ছে, ক্যা বাবু, আচ্ছা নিদ হুয়া? মেহেরবাণি করকে উঠিয়ে।

কালাচাঁদ হতভম্বের মত উঠে দাঁড়ালো। মাড়োয়ারীর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে হন হন করে প্ল্যাটফরমের দিকে ছুটলো—যে ধারে "বেনারস এক্সপ্রেস" দাঁড়িয়ে আছে। একটা কুলিকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললে—আর মাত্র দশ মিনিট বাকী গাড়ী ছাড়বার। সর্ব্বনাশ! তার চরিত্র সব গাড়ীতে উঠে পড়েছে। কালাচাঁদের হঠাৎ নজরে পড়লো—একটি বাঙ্গালী ছোকরা ছুটতে ছুটতে আসছে। পেছনে তিন চার জন কুলির মাথায় অসংখ্য মোট। কালাচাঁদের কষ্ট হল। বেচারা হয়ত ট্রেণ ফেলই করে বসবে। যুবকটিই জিজ্ঞাসা করলে—স্যার—আপনি কি প্ল্যাটফরমে যাবেন? কালাচাঁদ ঘাড় নাড়লো। তবে 'কাইণ্ডলি' আমার এই লগেজগুলো একটা 'ইণ্টারে তুলে দিলে বড্ড উপকার হয়। আমি টিকেটটা করে আসছি। ভদ্রলোকের মুখের চেহারা দেখে আর না বলতে পারলো না। আর সত্যিই সময়ও নেই। বোল্লে

তাতে কি! আমি যাচ্ছি আপনি 'টিকিটটা' তাড়াতাড়ি করে আসুন, টাইম কিন্তু নেই! বলে পা বাড়ালো।

গেটে টিকিট চাইতেই জবাব দিলো সঙ্গের লোক টিকিট করতে গেছে—এই কুলী সাক্ষী, ছেড়ে দিন ট্রেন ফেল হবে। গেটকিপার কুলির কথায় গেট ছেড়ে দিল। সব কমপার্টমেণ্ট প্যাক্ট-আপ। কোন রকমে মালগুলো জোর করে ঢুকিয়ে কালাচাঁদ সবে নেমেছে, এমন সময় ছোকরাটী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির, গাড়ীরও 'হুইসিল' বেজে উঠলো। 'থ্যাঙ্কস্'—অসংখ্য ধন্যবাদ! যা উপকার করলেন, কোনও দিন—

আর শোনা গেল না। কালাচাঁদের সম্মুখে কত প্লট-এর চরিত্র হুস্ হুস্ করে ছুটে চললো। আর সে এমনি হতভাগ্য একটাকেও খুঁজে বের করতে পারলো না।

গেট দিয়ে বেরোবার উপক্রম করতেই টিকিটের কড়া শাসন তাকে একেবারে মড়ার মত ফ্যাকাশে করে দিল। এখন উপায়? মোটে ত দু'টো পয়সা পকেটে। প্ল্যাটফরম টিকিটের দাম ত চার পয়সা। আর দু'টো কোথা থেকে আসবে? এ কথাটা ত এতক্ষণ মনেই হয় নি! কালাচাঁদ আমতা আমতা করে সমস্ত ঘটনা বলে গেল। টিকিট কালেকটার হেসে বল্লেন—বেশ ত মশাই! এই বল্লেন সঙ্গের লোক টিকিট করে আনছে, আবার এখন কথা ঘুরিয়ে বলছেন, রাস্তায় দেখা, তাকে চেনেন না। কে বিশ্বেস করবে মশাই আপনার এই গাঁজাখুরি গল্প? কালাচাঁদের

আর বলবার কি আছে—চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। টিকিট কলেক্টর স্বরটা মোলায়ম করে বল্লো, চলুন তবে ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে। আমরা কি করবো বলুন ?

'ষ্টেশনমাষ্টার' দু'ঘণ্টা আটক রেখে ভবিষ্যতে সাবধান হতে বলে এবং ভদ্রলোকের এই জুয়াচুরি শোভা পায় না ইত্যাদি নীতি উপদেশ দিয়ে সাড়ে সাতটার সময় বিদায় দিলেন।

সমস্তদিন উপোষ আর ক্লান্তিতে মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল। তবু কালাচাঁদ পা দুটোকে জোর করে চালিয়ে নিল, মাত্র আর দেড় ঘণ্টা সময়। দশাশ্বমেধ চল্লিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছতেই হবে। তারপর শেষ চেষ্টা চায়ের দোকানে। সঙ্গের দু'টো পয়সা হাত দিয়ে আর একবার নেড়ে দেখে কালাচাঁদ প্রাণপণে হাঁটতে লাগলো। ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর জমে যাবার উপক্রম সেদিকে তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই—চায়ের দোকানই শেষ সম্বল। হয়ত সমস্ত দিনে যা হয় নি--দশ মিনিটে চা খেতে খেতে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'তে পারে, না হয় পাঁচটা লোকের পাঁচটা কথাবার্ত্তাই গল্পের আকারে লিখে ফেলবে।

যথা সময়ে সে দশাশ্বমেধে এসে পৌছলো, ন'টা বাজতে এখনও পঁচিশ মিনিট বাকী। একটা ভিড়ওয়ালা দোকান দেখে কালাচাঁদ ঢুকে পড়লো। চা এক কাপ। ছোকরা ভৃত্য চা দিয়ে গেল। জিজ্ঞাসাও করলো, চপ, কাটলেট, ডেভিল, মামলেট ?

—না, কিছু না। কালাচাঁদ চাযের পেয়ালায় চুমুক দিল। আঃ—কি আরাম।

মিনিট দুই তিন সে কান খাড়া করে রাখলো কিন্তু তার পরই একবারে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। নাঃ—কোন আশাই নেই। এই মুহূর্তে দোকান ছেড়ে অন্য কোথায়ও যেতে পারলে এখনও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু পয়সা কোথায়? ষ্টেশন মাষ্টারের নীতি উপদেশ এখনও কানে ভোঁ ভোঁ করে বাজছে। দোকানে তখন আলোচনা চলছিল একটী অতি নিকৃষ্ট বিষয় নিয়ে, সাহিত্যে যার স্থানই নেই। যে বৃদ্ধ লোকটি আয়নার পাশে বসেছিলেন তিনিই এ বিষয়ের অবতারক। তাঁর ক'দিন হ'ল 'হজম' ঠিক হচ্ছে না—বড় 'আনইজি' (uneasy) 'ফিল, (feel) করছেন। জোলাপ নিয়েছেন কিন্তু তাও হজম হয়ে গেল। উত্তরে অনেকে অনেক রকম ওষুধের নাম বলে যাচ্ছেন—খালি পেটে গরম দুধ' কেউ বলছেন হরতুকি চিবোতে, কেউ বলছেন বেল পোড়া এমনি কত কী। কালাচাঁদের ইচ্ছে হচ্ছিল বুড়োটার দাড়ি ধরে টেনে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। চা অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, মনের ইচ্ছে মনেই থাকলো। টেবিলের ওপর 'ঠক' করে দু'টো পয়সা ফেলে কালাচাঁদ বেরিয়ে পড়লো। গির্জ্জার ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় ন'টা। আর কোন কথা নেই সোজা বাড়ীর পথ।

বাড়ী আসতেই কাদম্বিনী রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে কোমর বেঁধে হাজির

হ'লেন। তখন বোল্লাম রাত্রে কি খাবে—তা জবাবই দিলে না। আমিও খাবার করি নি। বন্ধুর বাড়ী যত ইচ্ছে নেমন্তন্ন খাও কিন্তু অতটা—

কালাচাঁদ চীৎকার করে বলে উঠলো —কিছু খাব না—যাও। ..ল, সোজা 'নজের ঘরে ঢুকে ছিটাকনি লাগিযে দিল। জুতাটা ছেড়ে, বিছানায ধপ করে শুযে লেপটা টেনে দিল আপাদ মস্তক। সে চাথ সম্পূর্ণ অন্ধকার। কাশীর সব জিনিষই আজ তার চক্ষুশূল। ধিক্ এহ তীর্থক্ষেত্রকে! ঢের ভাল কলকাতা! কোনদিন সেখানে প্লটএর অভাব হয না। কালাচাঁদের চোখ ফেটে জল বেরিযে লে। আজতো পেটে একরকম কিছুই পড়লো না। আবার কালও 'নিম্নিসনীব' হাত এড়াতে সমস্ত দিন রোগের ভান করে থাকতে হবে।

কাদম্বিনী ঠিক বলে—যারা যথার্থ ভদ্রলোক তাদের সাহিত্য চর্চ্চা শোভা পায় না।

"নিখিল ভারত প্রেম-দমন সম্মেলন"

(নক্সা)

বি-এ পাশ করিয়া কালীচরণ সমস্ত জগৎটাকে শূন্য দেখিতে লাগিল। পিতা মার্চ্চেণ্ট অফিসের চল্লিশ টাকা মাহিনার কেরাণী—স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার চালানোই কঠিন। এম, এ, ল' পড়ার খরচ জোগাইবে কোথা হইতে? ধার কর্জ্জ করিয়া কোন রকমে বি, এর কোঠা অবধি চালাইয়াছে, তারই ধাক্কার জের কত দিন চলিবে কে জানে। পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, পাশ তো করলি—এখন? কাঙ্গালী বলিল, দেখি, কোন চাকরী বাকরী—

পুত্রের সতেজ ভাব দেখিয়া তাঁহার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। মুখে বলিলেন, বেশ।

দুই বৎসর কাটিয়া গেল। কাঙ্গালীর চাকুরীর আশা ও স্পৃহা ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল। বন্ধুরা পরামর্শ দিল, অলস হইয়া বসিয়া না থাকিয়া কিছু কর। বন্ধুদের সহিত যুক্তি করিয়া কাঙ্গালী "বেকার সাহিত্য সম্মিলনী" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিল। ভবানীপুরে ঘর ভাড়া লওয়া হইল এবং সদস্যদের মাসিক চারি আনা চাঁদা ধার্য্য হইল। সভ্য সংখ্যাও অনেক হইয়া গেল।

কলিকাতায নাম ডাক আছে এরূপ ব্যক্তিকে বাছিযা সভাপতি করা হইল, কাঙ্গালী হইল কর্ম্মসচিব। প্রতিষ্ঠানেব মুখ্য উদ্দেশ্য— "সাহিত্যই জাতীয উন্নতির একমাত্র পাথেয"। মাসে একটি করিযা সম্মিলনীর অধিবেশন স্থির হইল এবং তাহাতে দেশের শিল্প, বাণিজ্য সমাজ সম্বন্ধীয় সমস্যামূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা প্রভৃতি পঠিত ও আলোচিত হইবে। শেষে জলযোগ ও চা'যে সদস্যগণকে আপ্যাযিত করা হইবে। শেষোক্ত বিষয়টিব জন্য প্রত্যেক অধিবেশনে সদস্যগণ নিজ নিজ কাজ কর্ম্ম ফেলিযা যোগদান করিতে আরম্ভ করিল।

দিন কতক বেশ উৎসাহের সহিত সম্মিলনীর কাজ চলিল। কিন্তু ঐ এক ঘেযে অধিবেশন আর ভাল লাগে না। কাঙ্গালীচরণ দেখিল, সম্মিলনীর ব্যাপক প্রচার আবশ্যক, শুধু কলিকাতার লোক ইহাতে মাতিলে কতটুকু সার্থকতা? সমস্ত ভারতব্যাপী ইহা লইযা আন্দোলন করিতে হইবে। নামের নেশা তাহাকে পাইয়া বসিযাছে। বড় বড় দৈনিকে সম্পাদকীয স্তম্ভে তাহার কর্ম্মোন্মাদনার সুখ্যাতিও বাহির হয। তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল।

যত অনিষ্টের মূল এই খবরের কাগজ। ছাপার হরফে নাম দেখিতে দেখিতে কাঙ্গালীর নামেব স্পৃহা এতই বাড়িযা গেল যে, দিনরাত শুধু কি উপাযে সহজে নাম জাহির করা যায় এই ফন্দী মাথায় খাটাইতে লাগিল।

তখন দেশে "সম্মেলনে"র খুব ধুম পড়িযা গিযাছে। সব কটিই

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্ট্রি কোং"

"নিখিল বঙ্গ" কিংবা "নিখিল বঙ্গ পুস্তক বিক্রেতা সম্মেলন"—"নিখিল ভারত প্রেস কর্ম্মচারী সম্মেলন"—"বেকার যুবক সম্মেলন"—"ধাঙ্গড় সম্মেলন"—"মেথর সম্মেলন"—"দিয়াশলাই ব্যবসায়ী সম্মেলন" ইত্যাদি ভারতে যত শ্রেণীর লোক বর্ত্তমান, প্রত্যেকের বিষয়েই সম্মেলন হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে। উহাদের উদ্দেশ্য ঐ শ্রেণীর লোকদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন। কিন্তু উদ্দেশ্য কার্য্যকরী হউক আর না হউক—কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তি সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রভৃতি হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকে, তদ্দ্বারা একটি বিরাট প্যাণ্ডেল নির্ম্মিত হয় এবং বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিদের আহার বাসস্থান এবং তাহার আয়োজন করিবার খরচ প্রভৃতিতে ঐ অর্থ ব্যয় হয় কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহা হস্তান্তর হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া একজনের পকেটে চির-বিশ্রাম লাভ করে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে অধিবেশন হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব গৃহীত হইলেই 'সম্মেলনে'র উদ্দেশ্য শেষ। ইহা লইয়া মাসাবধিকাল খবরের কাগজে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়—অধিবেশন সংক্রান্ত যাবতীয় ছবি প্রভৃতিও কাগজে ঘন ঘন প্রকাশিত হয়।

কাঙ্গালী দেখিল, ইস্কুলে পড়িবার সময় "ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর সুবর্ণ সুযোগ" প্রভৃতি বহু হ্যাণ্ডবিল দেখিয়াছে। এখন বিনা ব্যয়ে নাম কিনিবার ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় সুবর্ণ সুযোগ আছে কি না সন্দেহ।

"নিখিল ভারত প্রেম-দমন সম্মেলন"

পাশের বাড়ীর সাতকড়ি ঘোষের একমাত্র কন্যা কুমারী সুধীরা হঠাৎ পটাসিয়াম সায়োনেড আস্বাদ করিয়া চক্ষু মুদিল। বি, এস, সি—ফোর্থ—ইয়ার—ভবিষ্যতে অনেকেই উন্নতির আশা করিয়াছিল। এ কী পরিণাম। কারণ শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল। প্রেম ঘটিত ব্যাপার! পাশের বাড়ীতে থাকে—কাঙ্গালীর নজর বরাবরই সম্মেলনের কাজে ততটা দৃষ্টি রাখিতে পারে নাই। মেয়েটিকে সে ভাল বলিয়াই জানিত—তাহার ভেতর যে এতটা—রমণী-চরিত্র সত্যিই রহস্যময়। রাগ হইল "প্রেম" কথাটারও ওপর। যত অনিষ্টের মূল ঐ "প্রেম"। ইতিহাস আলোচনা করিলেও ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এতবড় একটা অন্যায় বিষয় দমনের এপর্য্যন্ত কোন প্রচেষ্টাই হয় নাই।

কাঙ্গালী স্থির করিল—এ ভার সে নিজেই লইবে। তাহার সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে এই "প্রেম" দমন করা। বেচারী সুধীরা!—এখনও তাহার ভাসা ভাসা চোখ দুটী কাঙ্গালীর চোখের সামনে নাচিতেছে।

প্রথমে কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট কাঙ্গালী মনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল এবং ইহার ফলে যে তাহাদের বেকার সাহিত্য সম্মিলনীর পক্ষে কিরূপ শুভ হইবে তাহাও বিশদভাবে বুঝাইয়া দিল। শুভ হউক আর না হউক, ব্যাপারটা যে বেশ মজাদার হইবে এবং দিনকতক সময়টা কাটিবে ভাল ইহা স্মরণ করিয়াই সকলে সানন্দে

সম্মতি প্রদান করিল এবং একযোগে সভাপতির নিকট আৰ্জ্জি পেশ করিল।

সভাপতি বলিলেন, বেশ। আগামী রবিবার বিশেষ অধিবেশনের বন্দোবস্ত করো—তাতেই সমস্ত সদস্যের সম্মুখে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

সকলেই সোৎসাহে হুজুগে মাতিয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট দিনে বিশেষ অধিবেশনে সব স্থির হইয়া গেল। কাঙ্গালীর উর্ব্বর মস্তিষ্ক খুব তাবিফ পাইতে লাগিল। কাঙ্গালী ভাবিল সূচনাতেই এতটা, শেষে না জানি কি হবে। নিম্নলিখিত কার্য্যসূচি প্রস্তুত হইল। "প্রেম দমন সম্মেলনে"র তিনদিন অধিবেশন হইবে। তিন দিন তিনটি বিষয়ের আলোচনা হইবে (১) কুমারী প্রেম (২) বিধবা প্রেম-(৩) সধবা প্রেম। সম্মেলনের মূল সভাপতি হইবেন,—শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ গিরি (হরিদ্বার) "কুমারী প্রেম শাখা"র সভাপতি হইবেন, প্রোফেসর শ্রীসর্ব্বানন্দ মোদক (এলাহাবাদ) "বিধবা প্রেম শাখা"র সভাপতি হইবেন—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিধন তর্কভূষণ (কাশী) এবং "সধবা প্রেম শাখা"র সভাপতি হইবেন মিঃ হৃদয়রঞ্জন সরকার.এম, এ-পি, এচ, ডি (উড়িষ্যা)। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইলেন সম্মিলনীর স্থানীয় সভাপতি। স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল 'টাউন হল' এবং প্রতিনিধিদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল উত্তর কলিকাতার কোন বিশিষ্ট কলেজে। তথা হইতে টাউন হল পর্য্যন্ত তিন দিন প্রতিনিধিদের জন্য বাস যাতায়াত করিবে। প্রতিনিধি

ফিঃ ৫৲—মাহলাদের ফ্রী। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের ১০৲। সম্মেলনের আনুমানিক ব্যয়ের বাজেট এক হাজার টাকা।

মূল সম্মেলনের উদ্বোধন হইবে আগামী ১০ই মে। সে দিন কেবল প্রাথমিক উদ্বোধন হইবে এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পাঠ হইবে। জলযোগের ব্যবস্থা থাকিবে।

উদ্বোধন করিবেন—স্যার গদাই প্রামাণিক, পি, আর এস্ (বোম্বে)

এ কয়দিন আর কাঙ্গালীর মরিবার ফুরসং নাই। সমস্ত দিন ভবানীপুর সম্মিলনীর অফিসে বসিয়া থাকিতে হয়। কোনদিন বা থালি চা বিস্কুট খাইয়াই কাটে। তথাপি কাঙ্গালীর আনন্দের সীমা নাই। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র হইতে প্রতিনিধিদের সাড়া আসিয়াছে। সবগুলি চিঠিই তার নামে। এসিষ্টাণ্ট সুশীল চক্রবর্ত্তী তার পাশে বসিয়া তার অনুমতিক্রমে যথাযথ উত্তর লিখিতেছে। কাজে এত সুখ কাঙ্গালী কোন দিন কল্পনাও করে নাই।

অর্থ সংগ্রহ বিভাগের সদস্যগণ উঠিয়া পড়িয়া বাড়ী বাড়ী ধর্ণা দিতেছে। এত বড় একটা বিরাট ব্যাপারে এবং দেশের প্রায় সব কটা বিশিষ্ট ব্যক্তিই ইহার ভিতর অল্প-বিস্তর জড়িত সুতরাং যথাসাধ্য দাক্ষিণ্যের ব্যাপারে কেহই "বাড়ী নেই" নীতি খাটাইতেছেন না। এক হাজার টাকার অনেক বেশী অর্থ সংগৃহীত হইল।

ইতিমধ্যে খবরের কাগজের সম্পাদক মহাশয়গণকে একদিন সম্মিলনীর সভাপতির গৃহে "এ্যাট হোম" এ আপ্যায়িত করা

হইযাছে। এই "প্রেম দমন সম্মেলনে"র কৃতকার্য্যতার জন্য সকলেই নিজ নিজ কাগজে যতদূর সম্ভব স্থান নির্দ্দেশ করিযা দিবেন—প্রতিশ্রুত হইযাছেন।

এত কাজ কর্ম্মের ভিতরেও অবসর পাইলেও সুধীরার রমণীয মুখখানা কাঙ্গালীর চোখের সামনে ভাসিযা উঠে। কাঙ্গালী দেখিল নিজের অজ্ঞাতসারে সে নিজে সুধীরার প্রেমে পড়িয়া গিযাছিল। কিছুতেই সে চিন্তা মন হইতে দূর করিতে পারে না।

যথা সময়ে প্রতিনিধিবর্গের কলতানে কলেজ গৃহ মুখরিত হইল। উদ্বোধন দিবসের পূর্ব্বদিন—শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুদানন্দ গিরি হরিদ্বার হইতে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের এবং বিভিন্ন শাখার সভাপতি-ত্রযের আহার এবং বাসস্থান সম্মিলনীর স্থাযী সভাপতির গৃহে সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিযা তাঁহাদের ষ্টেশন হইতে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া আনিল। রাত্রে বিভিন্ন শাখার সভাপতিগণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসর সরগরম হইল।

১০ই মে। ঘড়িতে এলার্ম বাজিতেই কাঙ্গালী ধড়ফড় করিয়া উঠিযা বসিল। তখনও ৫টা বাজে নাই—ক্ষিপ্রহস্তে দাড়ি কামাইয়া স্নান সারিয়া বেশভূষা সমাপনান্তে কাঙ্গালী অফিসে ছুটিল। বেলা ২ টায উদ্বোধন।

মহিলা প্রতিনিধিদের আবাসস্থল উক্ত কলেজেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদের সুখ সুবিধা প্রভৃতি তদারক করিবার ভারও কাঙ্গালীর

উপর। আজ আহারাদির হাঙ্গামা ১০ টার ভিতর চুকাইতে হইবে। সহকারী সুশীলের কাল জ্বর হওয়াতে কাঙ্গালীর কাজ দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

মহিলা প্রতিনিধিদের মধ্যে এলাহাবাদের ডাঃ রক্ষিতের স্ত্রী এবং কন্যার সহিত কাঙ্গালীর এ কয়দিনে বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। ডাঃ রক্ষিতও প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছেন। তাঁর স্ত্রী সুরমা দেবী খুব মিশুক প্রকৃতির। অল্প সময়েই কাঙ্গালীকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। কাঙ্গালী তাঁহাকে দিদি বলিয়া ডাকে। মীরা এইবার আই, এ দিবে। সেও কাঙ্গালীর সঙ্গে অবাধে কথাবার্ত্তা বলে। দিদি তাহাকে এলাহাবাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সম্মেলনের কাজ শেষ হইলে তাহাকে যাইতে হইবে। সে সানন্দে রাজী হইয়াছে।

সাড়ে আটটার সময় কাঙ্গালী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দিদির ঘরের দরজায় হাজির হইল।

ওকি! এখনও শুয়ে—দিদি কোথায়?

—মা ৪নং রুমে গেছেন। সেই রেঙ্গুণ থেকে যিনি এসেছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে। আসুন, মীরা উঠিয়া দাঁড়াইল।

আপনি তো বেশ লোক! আমার এখন মরবার সময় নেই। আমি এসেছি আপনাদের তাড়া দিতে—১০টার ভেতর নেয়ে খেয়ে তৈরী হ'তে হ'বে জানেন তো? না হ'লে শেষে জায়গা পাবেন না।

মীরা মৃদু হাসিয়া বলিল, তা হ'লে আর কর্ম্মসচিবের সঙ্গে আলাপের সার্থকতা কোথায়? আপনি আছেন কি দেখতে?

কাঙ্গালী হাসিয়া বলিল, আপনি কি তখন সেই সুযোগ নেবেন না কি?

নিলেই বা! ক্ষতি কি?

কাঙ্গালী টপ করিয়া বলিল, কিন্তু লোকে যে সন্দেহ করবে।

মীরা মুখ তুলিয়া চাহিল। কী সন্দেহ?

এই—প্রেম-দমনের সেক্রেটারী নিজেই উল্টো সুর ধরেছে—বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মীরা লজ্জিত হইল। আরক্ত মুখে বলিল, আপনার সঙ্গে কথায় পারবার যো নেই।—আচ্ছা—ঠিক সময় তৈরী থাকবো, আপনার ভাবনা নেই। এলাহাবাদে যাচ্ছেন তো?

কাঙ্গালী ততক্ষণ ঘরে ঢুকিয়া চেয়ার দখল করিয়াছে। বলিল—হঠাৎ?

কেন? আপনি যে মায়ের কাছে সেদিন বোল্লেন।

ওঃ—কথাটা কাঙ্গালীর স্মরণ হইল। কিন্তু একটু মজা করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, কিন্তু দেখলুম এখন যাওয়া হবে না।

কেন?

এই—কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকবো—সময় হ'বে না। তার ওপর সম্মিলনীর বার্ষিক উৎসব আসছে। মীরা একটু ক্ষুণ্ণ হইল।

কবে যেতে পারবেন?

কাঙ্গালী ঠিক এই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। হাসিয়া বলিল—আপনার বিয়ের সময়।

মীরা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

যান্—আপনি বড়—

আচ্ছা আর বলবো না,—মাপ চাইছি।

—হ'লতো?

কাঙ্গালী হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইল। মীরাও উঠিয়া দরজা অবধি আসিল।

এগারোটায় ঠিক আসবেন কিন্তু—নিশ্চয়। কাঙ্গালী ততক্ষণ সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিয়াছে।

বেলা একটা বাজিতে না বাজিতেই দলে দলে প্রতিনিধি ও দর্শকগণ আসিয়া 'টাউন হল' পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ যথাসাধ্য সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে কার্য্যের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছিল। সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি চারিদিকে ঘুরিয়া সকলকে আদর আপ্যায়নে সন্তুষ্ট করিতেছিলেন। সব ফিট্-ফাট্। বন্দোবস্তের কোন ত্রুটী নাই।

দিদি ও মীরা আসিয়াছেন। কাঙ্গালী তাঁহাদের জন্যই এতক্ষণ উপর নীচ ঘন ঘন ছুটাছুটি করিতেছিল—আসিতেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া ভাল দেখিয়া একটা আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। কেউ না শুনিতে পায় এম্নি ভাবে মীরাকে বলিল, সুযোগ একটু পেলেন। পরে পুরস্কার চাই কিন্তু।

মীরা মৃদু হাসিয়া মাথা হেলাইল। কাঙ্গালী দেখিল, মীরার

চাহনি—হাসি—দেহের লীলায়িত ভঙ্গী প্রত্যেকটির নিকট সুধীরা হার মানিবে। মীরার যেন সবই সুন্দর।

ঠিক দুইটা বাজিবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে স্যার গদাই প্রামাণিক উপস্থিত হইলেন। সকলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। যথারীতি আসন গ্রহণ করিবার পর বালীগঞ্জ মহিলাসঙ্ঘের তরুণী-বৃন্দ কর্ত্তৃক একটি 'কোরাস' সঙ্গীত গীত হইল। কাঙ্গালী বহুকষ্টে ইহাদের আহরণ করিয়াছিল। অবশেষে গদাই প্রামাণিক তাঁর বিপুল দেহ লইয়া দাঁড়াইলেন। দেহ অনুপাতে কণ্ঠের উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই সে জন্য অনেকটা চিঁ চিঁ রবে মামুলী ধন্যবাদ দিয়া তিনি আরম্ভ করিলেন।—"মাননীয়, ভদ্রমহোদয়গণ, প্রিয় ভাই সকল ও ভগ্নীগণ, আমরা আজ কি জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি তাহা সকলেই অবগত আছেন। 'বেকার যুবক সম্মিলনী' আজ যে কার্য্যের ভার লইয়াছেন তাহা আধুনিক যুগের প্রধান ও অন্যতম সমস্যা। এই বিরাট সমস্যামূলক সম্মেলনে আমাকে উদ্বোধন কার্য্যে ব্রতী করিয়া তাঁহারা আমার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।"

মুহূর্ত্তখানেক দম লইয়া আবার আরম্ভ করিলেন। "ভারতের দিকে দিকে আজ যে হাহাকার উঠিয়াছে—বুভুক্ষু নিরন্ন ভারতবাসী যে জন্য আজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিপীড়িত ও পরাজিত হইতেছে —যে জন্য মাতৃজাতির পরিধেয় বস্ত্র নাই—শিশুদিগের প্রাণধারণের

জন্য উপযোগী দুগ্ধ নাই—শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসার কিছুই নাই, এমন কি মানবত্বের যা চরম আদর্শ সেই ভগবৎ ভক্তি, স্নেহ, দয়ামায়া প্রভৃতিও আমরা হারাইতে বসিয়াছি—সমস্ত সমস্যারই সমাধান হয় যদি সৃষ্টি ধ্বংস-কারী মূর্ত্তিমতী রাক্ষসী স্বরূপা এই হেয়, লুব্ধ জঘন্য 'অবৈধ প্রেম' প্রবৃত্তি মানুষের মন হইতে চিরতরে বিদূরিত হয়।"

শেষের কথাগুলি সজোরে বলা হইয়াছিল সে জন্য ঘন ঘন করতালি, 'হিয়ার হিয়ার' শব্দে সভাস্থল মুখরিত হইল। তালির বহর কিঞ্চিত উপশম হইলে তিনি আবার আরম্ভ করিলেন :

"বেকার যুবক সম্মিলনী" এই সমস্যার উত্থাপন করিয়া সমস্ত ভারতবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহাদের এ ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রম সফল হউক এবং প্রেমে অবসন্ন ভারতবাসীর হৃদয়ে নবজীবনের সঞ্চার করুক। আমার আর কিছুই বলিবার নাই।"

বিকট করতালির ভিতর তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। সম্মিলনীর স্থায়ী সভাপতি তাঁর অভিভাষণ পাঠ করিয়া উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপর কাঙ্গালী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের টেলিগ্রাম পাঠ করিল। সকলেই 'প্রেম-দমন সম্মেলনে'র শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন।

উদ্বোধন পর্ব্ব শেষ হইল।

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইন্‌ডাস্‌ট্রি কোং"

১১ই মে। অনুষ্ঠান পর্ব্বের প্রথম দিবস। "কুমারী প্রেম শাখার" অধিবেশন। সকাল আটটার সময় অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হইল। দু'একটি প্রবন্ধ, কবিতা পাঠ হইবার পর সভাপতি প্রোফেসার সর্ব্বানন্দ মোদক তাঁর অভিভাষণ আরম্ভ করিলেন। পূর্ণ দেড় ঘণ্টা ব্যাপী তিনি অভিভাষণ পাঠ করিলেন। উহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "কুমারী প্রেমের মূল কারণ পরিণত বয়স্কা বালিকাদের অবিবাহিত অবস্থায় ঘরে পুষিয়া রাখা এবং আধুনিক তথাকথিত আভিজাত্যের দোহাই পাড়িয়া পুরুষদিগের সহিত অবাধ মেলামেশা। নারী শিক্ষা খুবই প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, তবে যথাসময়ে প্রকৃতিগত রিপুর তাড়নাকে উপেক্ষা করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে গেলেই যত অনর্থ ঘটে। সুতরাং আমাদের সনাতন বাল্য প্রথার প্রচারই 'কুমারী প্রেম" দমনের একমাত্র সহায়ক। অদূর ভবিষ্যতে 'বাল্য বিবাহ' প্রচলিত না হইলে সামাজিক অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।" উপরোক্ত মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং ইহার প্রচার কল্পে কমিটি সাব কমিটি পর্য্যন্ত গঠিত হইয়া গেল।

অধিবেশন শেষ হইলে কাঙ্গালী এক সময় নির্জ্জন পাইয়া মীরাকে বলিল, কথাটা সেদিন মিথ্যে বলিনি। নেমন্তন্নের ব্যবস্থাটা শীঘ্রই করুন—যে রকম ব্যাপার দেখছি বিশেষ ভরসা নেই।

মীরা বলিল, আপনাদের জন্যেই তো ভয়। না হ'লে ভরসা সম্পূর্ণই আছে।

কাঙ্গালী হাসিয়া বলিল, ইস্—দেখা যাবে।

মীরা বলিল, আমাদের তো ফাঁড়া কাটলো—কালকে বিধবাদের কি ব্যবস্থা হ'বে ?

কাঙ্গালী উত্তর করিল,

তর্কভূষণ মশায়ের যে রকম অভিরুচি !

দিদি আসিয়া বলিলেন, রাত্রে এখানে খাবি। কাঙ্গালীর পক্ষে প্রার্থনাতীত অনুগ্রহ।

১২ই মে। "বিধবা প্রেম শাখার" অধিবেশন। সকাল আটটায়। মাল্যবিভূষিত—কপালে ফোঁটা তিলক তর্কভূষণ মহাশয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। মূল বক্তব্য, বিধবা বিবাহ প্রচলনের স্বপক্ষে। এমন কি 'কচুরী পানা' দমন আইনের মত বাল্য বিধবাদের বিবাহার্থে আইন পাশের জন্য মহামান্য সরকার বাহাদুরকে অনুরোধ করা হউক, এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং ইহা প্রচলনের জন্য একটি প্রচার বিভাগও খোলা হইল। তাহাতে কমিটি সাব কমিটি প্রভৃতি সবই থাকিবে।

সভাস্থ বিধবাদের ভিতর আনন্দের উত্তেজনা বহিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় কাঙ্গালী দিদির ঘরে চা খাইতে আসিয়া মাথা ধরাতে মীরা মাথা টিপিয়া দিয়াছিল। শেষে নাকি যন্ত্রণা বৃদ্ধি প্রাপ্তির জন্য রাত্রে বাসায় যাইতে পারে নাই। আমরা ইহা শুনিয়াছি মাত্র।

১৩ই মে। শেষ দিন। "সধবা প্রেম শাখার" অধিবেশন। মিঃ হৃদয়রঞ্জন সরকার সুযুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ

করিলেন। অভিভাষণের মূল মর্ম্ম নিজের স্ত্রীকে অপর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করিতে দেওয়া অনুচিত। প্রয়োজন অনুসারে দিলেও স্বামীকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিশেষ করিয়া অপর পুরুষ যদি স্বামী অপেক্ষা সুন্দর হয় তবে সেই পুরুষের সান্নিধ্য স্ত্রীকে বিষবৎ ত্যাগ করাইতে হইবে। এই শাখা বিবাহিতা স্ত্রীর অবাধ মেলামেশার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। যথারীতি প্রস্তাব গৃহীত হইল।

ফুরাল রে গাছের আম—
কি খাবি রে হনুমান।

অবশেষে 'প্রেম-দমন সম্মেলন'ও শেষ হইল। ততঃ কিম?

নামের নেশা কাঙ্গালীর ছুটিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত আর ভালও লাগে না—কাঙ্গালীর মন যেন কোথায় বাঁধা পড়িয়াছে। সম্মিলনীর কাজ ক্রমেই ঢিলা হইয়া আসিতে লাগিল। সুশীল একদিন ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, ডাঃ রক্ষিতের কা খবর? চিঠি পত্র পাস্?

কাঙ্গালী বিমর্ষ হইয়া রহিল। বলিল, যাঃ—শরীর খারাপ। সভাপতি বলিলেন, চেঞ্জে যাও। এলাহাবাদ মন্দ কি। কাঙ্গালী কম্পিত বক্ষে, নববধূর প্রথম স্বামী সম্ভাষণের মতো দিদির বাড়ী হাজির হইল।

পরে আমরা শুনিলাম নির্জ্জনে কাঙ্গালী ও মীরার পরস্পর সম্বোধন প্রথা 'আপনি'র পর্য্যায় হইতে 'তুমি'তে অবতরণ করিয়াছে। আশাপ্রদ।

"নিখিল ভারত প্রেম-দমন সম্মেলন"

এলাহাবাদ থাকিতেই কোন একটি বিখ্যাত মাসিকে কাঙ্গালী একটি প্রবন্ধ পড়িল। প্রবন্ধটির নাম—"পরকীয়া প্রেম" লেখক তাহাদের সধবা প্রেম শাখার সভাপতি—মিঃ হৃদয়রঞ্জন সরকার। 'পরকীযা প্রেম' বিশুদ্ধ হইলে তাহা যে অবশেষে ভগবৎ প্রেমে পরিণত হইতে পারে প্রবন্ধের ইহাই মূল ভিত্তি। উদাহরণ স্বরূপ 'পরকীযা প্রেমে'র প্রতীক চণ্ডীদাস ও রামীকে দাঁড় করান হইযাছে। বিল্বমঙ্গলও বাদ পড়েন নি।

ইহার দিন কতক পরেই সংবাদপত্র ও সাপ্তাহিক গুলিতে মহা হুলুস্থূল পড়িযা গেল। মীরাই কাঙ্গালীকে একদিন এ বিষয়ে প্রণিধান করাইযা দিল।

দেখলে তো—তোমার সধবা প্রেম শাখার সভাপতির কাণ্ডটা? বন্ধু পত্নী তছরূপের মামলায় নিজেকে জড়িয়েছেন। তোমাকেই বা একলা দোষ দোবো কী? বলিযা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কাঙ্গালী তাহার হাত ধরিযা পাশে বসাইল। কথাটা যখন উঠলোই তবে শোন বলি—শ্রীমৎ স্বামী অমৃতানন্দ গিরির ও—সহাস্তে মীরা বলিল, তা হ'লে তর্কভূষণ মহাশয়ের—চুপ! চুপ! কাঙ্গালী হাত দিযা মীরার মুখ চাপিযা ধরিল। ছিঃ—গুরুজনের বিরুদ্ধে ও সব আলোচনা করা পাপ।

মীরার সঙ্গে কর্ম্মসচিবের বিবাহের পর "বেকার সাহিত্য সম্মিলনী" ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

'দস্তুরমত প্রব্লেম'

নক্সা

আজকাল সভা-সমিতি করাটা অনেকটা বদ অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কোন একটা ছুতা পাইলেই হইল—দেখিতে দেখিতে একটা বিরাট সভা হইয়া প্রস্তাব গৃহীত হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। এ বিষয়ে যে দেশবাসীর একতা আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বস্তু কমিটি স্থাপন। রাজনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, যে কোন সমস্যাই হউক না কেন—কমিটি না হইলে সমাধান হওয়ার উপায় নাই।

দেশের অনুরূপ আবহাওয়ার ভিতর পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের ছাত্রী "কমরেড" দীপ্তিরাণী কাগজে একটি বিরাট "নারী জাগরণী" সম্মেলনের নোটীশ দিয়া বসিল। দীপ্তিরাণীর এই অপ্রত্যাশিত আহ্বানে নেতৃস্থানীয়ারা মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। আবার আর একটা কেন?

কারণ অবশ্য চাপা থাকিল না। দীপ্তিরাণীর অন্তরের ব্যথা বন্ধুরাই উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। ঘটনাটা এমন কিছুই গুরুতর নয়,

(বিশেষ করিয়া আধুনিক যুগে) অথচ দীপ্তি ইহাকেই আধুনিক অন্যতম সামাজিক সমস্যা বলিয়া জোর গলায় প্রচার করিতে লাগিল।

সীতাংশু উদীয়মান সাহিত্যিক। একই পাড়ায় থাকে। দীপ্তিদের বাড়ীতে কোন সূত্রে তাহার অবাধ গতিবিধি আছে। ইহারই অবশ্যম্ভাবী জের টানিয়া দীপ্তি তাহার প্রেমে পড়িল। পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, পত্রবিনিময় ইত্যাদি স্তরের মধ্য দিয়া প্রেম যখন বেশ পুষ্ট হইতেছিল, তখন হঠাৎ একদিন গোধূলি লগ্নে দীপ্তি সীতাংশুকে ধমকাইয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল।

অপরাধ—সীতাংশু যে বিবাহিত এ কথা দীপ্তির নিকট ভুল করিয়াও সে প্রকাশ করে নাই কেন ?

অর্থাৎ, তাহা হইলে সে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইতে পারিত এবং সীতাংশুকে কোনক্রমেই প্রশ্রয় দিত না। এ দুঃসংবাদটি দীপ্তি অদ্যই আর, একটি যুবকের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছে। যুবকটি তাহার সহপাঠী। সম্প্রতি বাড়ী বদল করিয়া এ পাড়ায় উঠিয়া আসিয়াছে।

ইহাই হইল নারী জাগরণী সম্মেলনের মুখবন্ধ। খবরের কাগজের অসাধ্য কাজ কিছুই নাই। "নারী জাগরণী"র বিজ্ঞাপন ছাপা হইবামাত্র নানাস্থান হইতে নানারূপ পত্রাদি আসিতে লাগিল। সম্মেলনের উদ্দেশ্য—স্থান, কাল নিয়মকানুন সম্বন্ধে অজস্র প্রশ্ন। প্রশ্ন যখন উঠিয়াছে, উত্তরও তার দেওয়া চাই। কাগজের মারফতেই সব আদান প্রদান চলিতে লাগিল। ফলে "পাবলিসিটি"টা

জাঁকজমক পূর্ণই হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া নারী-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সম্পাদকগণ একেবারে মুক্তহস্ত হইয়া উঠিলেন।

সভানেত্রী হইয়াছেন—শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী চোংদার। কলিকাতায় তাঁর বাড়ী আছে, মোটর আছে, উপরন্তু তিনি বক্তৃতা দিতে পারেন। দীপ্তির মতে ইহার অধিক "কোয়ালিফিকেশন" সভানেত্রীর প্রয়োজন নাই। স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে এলবার্ট হলে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে বেলা পাঁচ ঘটিকায় বিরাট মহিলা সমাগমের মধ্যে (লাউড স্পীকারের বন্দোবস্ত ছিল) পূর্ণাঙ্গ বন্দেমাতরম সঙ্গীতের পর কমরেড দীপ্তিরাণী সম্মেলনের উদ্বোধন করিলেন। ভারতের সর্ব্বত্র হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মাড়োয়ারী কোন ধর্ম্মেরই অভাব নাই ইহাদের মধ্যে তরুণী ও প্রৌঢ়া দুই-ই আছে।

জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রসঙ্গে দীপ্তিরাণী যাহা বলিলেন তার সারাংশ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

সীতাংশুবাবু-ঘটিত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ কৌশলে উত্থাপন করিয়া তিনি সমবেত মহিলাগণকে অনুরোধ করিলেন,

—আপনারাই বলুন, সেই ভদ্রলোকের দোষ—না আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার দোষ?

(কেহ কোন উত্তর দিলেন না)

একটু থামিয়া দীপ্তি বলিতে লাগিল,

আপনারা বোধ হয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছেন না।

"দস্তুরমত প্রব্লেম"

আমরা অর্থাৎ মহিলারা যারা বিবাহিতা (আমি এখানে বিশেষ করে হিন্দু রমণীর কথাই বলছি) তাদের বিবাহের প্রমাণ মাথায় জল জল করছে। তাদের এটা লুকোবার কোন উপায় সমাজ রাখে নি। আবার যেখানে সীমন্তে সিঁদুরের ব্যবস্থা নাই—সেখানে বিবাহিতারা অবগুণ্ঠন দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ আমার বক্তব্য এই যে বিবাহিতা অবিবাহিতা রমণীর পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু বিবাহিত পুরুষদের অনুরূপ কোনও প্রমাণ বা দৈহিক কোন চিহ্ন আছে কি? না—নেই। নেই বলেই তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-বোধ করে না।

(সেম্ সেম্ ধ্বনি)

ভগ্নিগণ! আমরা এতই নির্ব্বোধ যে তা বুঝতে না পেরে তাদের মোহজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। তার ফল যে কি বিষময় তা আপনারা জানেন। একটু আগেই আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের শুনিয়েছি। শুধু আমার নয়—ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ তরুণীর ভাগ্যে এইরূপ অপমান সর্ব্বদা ঘটেছে।

প্রতারক পুরুষের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনই উপায় নেই যতদিন পর্য্যন্ত না আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয়। দেশের শাসনকর্ত্তাদের এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতেই হবে।

(হাততালি পড়িল)

—এর কি প্রতিকার হতে পারে, আপনারা একে একে প্রস্তাব করুন।

দীপ্তি আসন গ্রহণ করিবামাত্র সভার ভিতর একটা অস্ফুট গুঞ্জন-ধ্বনি প্রবাহিত হইল। তাহার বক্তৃতা সকলের ভিতরই একটা চাঞ্চল্য আনিয়া দিয়াছে।

জনৈক তরুণী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর দিলেন,

—আমি প্রস্তাব করি, বিবাহিত পুরুষের এইরূপ গোপনীয় আচরণ আইনতঃ দণ্ডনীয় হওয়া উচিত।

প্রস্তাব যথারীতি সমর্থিত হইল।

দীপ্তি প্রস্তাব সম্বন্ধে মন্তব্য করিল,

—পুরুষেরা আইনতঃ দণ্ডনীয় হলেও তরুণীদের যা অভাব তা পূরণ হবার উপায় নেই। সুতরাং আমার মতে এ প্রস্তাব খুব সমীচীন বলে মনে হয় না

ইহার পর একটু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইল। নানারূপ প্রস্তাব হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ।

একজন বাঙ্গালী তরুণী প্রস্তাব করিলেন,

—আমাদের মত বিবাহিত পুরুষেরও সিঁথিতে সিঁদুরের ব্যবস্থা করা হোক।

জনৈক মুসলমান মহিলা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মে সিঁদুরের ব্যবস্থা নাই—ইহা তাঁহারা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন।

“দস্তুরমত প্রব্লেম”

সভানেত্রী মহাশয়া শান্তি স্থাপন করিয়া বলিলেন,

—আপনারা সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা এখানেও টানবেন না। সব ধর্ম্মে যাহা সঙ্গত হয় সেইরূপ প্রস্তাব করতেই আমি অনুরোধ করি।

এবার উঠিলেন মাড়োয়ারী তরুণী। তাঁহার প্রস্তাবের মর্ম্ম, পুরুষের মাথার টেরীর ডান-বাঁ হিসাবে বিবাহিত অবিবাহিতের পার্থক্য করা যাইবে। উদাহরণ দিয়া তিনি বলিলেন, মাননীয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়ন করিবেন যে যাহারা বিবাহিত তাহাদের ডানদিকে টেরী কাটিতে হইবে, তাহা হইতে মহিলারা টেরী দেখিয়া পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারিবেন।

ইহারও প্রতিবাদ হইল। প্রতিবাদ করিলেন জনৈক পাঞ্জাবী মহিলা। তাহাদের পুরুষের টেরী বলিয়া কোন বস্তু নাই। বাল্যকাল হইতেই তাহারা চুল ঝুঁটি করিয়া বাঁধিয়া থাকে। তাহার উপর পাগ্ড়ী আছে—সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে “টেরী” বিষয়ক কোন কথা উঠিতেই পারে না। সমবেত পাঞ্জাবী মহিলারা ‘হিয়ার’—‘হিয়ার’ করিয়া উঠিলেন।

এবার উঠিল মন্দার। তাহার প্রস্তাবের মর্ম্ম বিবাহিত পুরুষদের ছোট একটু, টিকি রাখিলে বিশেষ অসুবিধা হইবে না। অবশ্য পাঞ্জাবী মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় নাই।

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্ট্রি কোং"

ইহারও প্রতিবাদ হইল মুসলমান পক্ষ হইতে এবং হিন্দুস্থানী রমণীদিগের তরফ হইতে। হিন্দুস্থানী তরুণী বলিলেন যে, তাহাদের জাতীয় প্রথা অনুযায়ী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর কেশোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই "টিকি"র ব্যবস্থা হয়। ইহা শাস্ত্র-সঙ্গত এবং ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে জাতিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং বিবাহিত অবিবাহিতের পার্থক্য "টিকি"র মাপকাঠিতে চলিতে পারে না। তা ছাড়া আধুনিক কালে শিক্ষিত হিন্দুস্থানীরা টিকিকে লজ্জাজনক মনে করেন এবং এইজন্য এমন ভাবে চুলের সঙ্গে মিশাইয়া রাখেন যে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে "মাইক্রোসকোপে"র প্রয়োজন।

(সকলের হাস্য)

দীপ্তি দেখিল বিষয়টা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। এইরূপ-ভাবে প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে থাকিলে ভোর হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। রাত্রি বারোটা অনেকক্ষণ বাজিয়া গিয়াছে। সভানেত্রীর কানে কানে সে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন,

—বিবাহিত পুরুষদের দৈহিক কোন স্থায়ী চিহ্ন কিংবা কোন 'সিম্বল' হওয়া উচিত এ বিষয়ে আমাদের কোনও মতভেদ নাই। আপনারা সকলেই তা চান—

(চাই—চাই ধ্বনি)

"দস্তুরমত প্রব্লেম"

আমাদের মতের অমিল হচ্ছে সেইরূপ চিহ্নের প্রকার-ভেদ সম্বন্ধে। আমার মতে এটা "সেকেণ্ডারী ফ্যাক্টর"। এত বড় প্রকাশ্য সভায় এর একটা মীমাংসা হতে খুবই বিলম্ব হবে। সেইজন্যে আমি প্রস্তাব করি—মূল প্রস্তাব আপনারা গৃহীত করে নিন এবং চিহ্ন সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার জন্য পনেরো জন প্রতিনিধি নিয়ে একটা কমিটি হোক। কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ঘন ঘন হাততালি দিয়া সভানেত্রীর বক্তব্য সকলেই সমর্থন করিলেন।

অতঃপর দীপ্তি প্রস্তাব পাঠ করিল, "অদ্যকার এই সভা ভারতের বিবাহিত অবিবাহিত পুরুষ নির্ণয়ের জন্য তাহাদের দৈহিক কোন পার্থক্যের চিহ্ন দাবী করিতেছে, এবং মাননীয় সরকার বাহাদুরকে অনুরোধ জানাইতেছে যে, কোন বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়ন করিয়া অনুরূপ ব্যবস্থা যথাসম্ভব শীঘ্র প্রচলন করিতে। আইন অমান্যকারীগণের সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা থাকিবে।

'ইনক্লাব'—'জিন্দাবাদ' ধ্বনির ভিতর প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া গেল।

পনেরো জন প্রতিনিধি লইয়া একটা অস্থায়ী কমিটিও যথারীতি গঠিত হইল। একমাসের ভিতর তাঁহারা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন।

"অল ইণ্ডিয়া হেয়ার ইনডাস্ট্রি কোং"

সভাশেষে সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল ; অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল রাত্রি দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে এবং যে কয়টী বালিকা কোরাস্ গাহিবে তাহারা 'প্ল্যাটফর্মে'র উপর এ উহার গায়ে পড়িয়া নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইতেছে। ধমক দিয়া উঠান হইলে—"জন-গণ-মন-অধিনায়ক"-এর পরিবর্ত্তে তাহারা সমস্বরে—ভ্যাঁ—করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা